

# শারদীয়া

১৪২৫



# আত্মজন

## সম্পাদকীয় কথন:

গুটি কয়েক সুহৃদের ঐকান্তিক ইচ্ছা ; শ্রম;এবং চেষ্টায় নাতিদীর্ঘ সময়ের মধ্যে আমরা 'আত্মজন' শারদীয়া সংখ্যা নিয়ে এসেছি। এটি আমার প্রথম কাজ। পাঠক বর্গের কাছে অনুরোধ যাবতীয় ত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। যাঁরা কবিতা ; গল্প; প্রবন্ধ সহ অন্যান্য বিভাগের জন্য নিজ নিজ প্রতিভার স্ফূরণ ঘটিয়েছেন তাঁদের আমার শ্রদ্ধা; ভালোবাসা জানাই। শুভ শারদীয়া ১৪২৫ বঙ্গাব্দ। পূজা ভালো কাটুক প্রত্যেকের। মঙ্গলময়ীর কাছে পরিচিত দের সুস্থতা এবং শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি...।

**ধন্যবাদান্তে**

**শুভম বন্দ্যোপাধ্যায়**

## সূচিপত্র :

---

### #কবিতা

---

#তিতাস বন্দ্যোপাধ্যায়

#দেবশিস রায়কাশ্যপ

#আলোকদূত

#অমলেন্দু হালদার



### ছোটোগল্প :

---

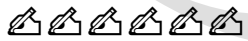
#বাইশে শ্রাবণ- অনিন্দ্য গৌতম

#আমি ও তিতলি- দেবশীষ তালুকদার

#নৌকা- অনিন্দিতা

#প্রেমের মিলন - মহেশ্বর মাজি

#যখন নামবে আঁধার- অংশুমান রায়



### ভ্রমণ :

---

#রোদ ওঠানো দেশের জন্য- মৃণাল ঘোষ



## বিবিধ প্রবন্ধ:

#পরকীয়া প্রসঙ্গে- মৃণাল ঘোষ

#অর্থস্য সদ্ব্যবহারঃ কুরু- শুভম বন্দ্যোপাধ্যায়



## বিশেষ রচনা:

#কথা সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

#হলিউডের রূপকথা - অনিন্দ্য গৌতম

#Solar Energy: Raghav Agarwal



একটু হাসুন: সৌজন্যে দেবশীষ তালুকদার



## চিত্র প্রভা:

সঞ্জনা বেরা; অরুণ্য ঘোষ; তিতিষা নায়েক; নবমী লাহা।



## শুভ মহালয়া



-তিতাস বন্দ্যোপাধ্যায়

বোধনের মন্ত্র পড়তে পড়তে বাবা ফিরে আসছে...

ধূলোর গন্ধটুকু মুছে দিতে মা রোদে ফেলছে পুরনো জামাকাপড়...

শিউলিতলায় দিকশূন্যপুর আবিষ্কার করে বোনের দুহাত মেখে নিয়েছে উৎসবী সাদা...

ভাই আর ওর বন্ধুরা বুড়ো ছাতিম গাছটার চারদিকে লক্ষণগণ্ডি ঐকে ছোঁয়াছুঁয়ি খেলছে ...

এবং সব স্মৃতি আঁচলে ভরে

আমি এই পুণ্য প্রভাতে, হেঁটে যাচ্ছি দাদুর রেখে যাওয়া ঘাড় কাত রেডিওটার দিকে...

বীরেন্দ্র ভদ্র অপেক্ষা করছেন বলে...

## বাইশে শ্রাবণ

- অনিন্দ্য গৌতম

অনিকেত কোয়ার্টারের বারান্দায় বেতের চেয়ারটায় বসে চায়ে চুমুক দিয়ে স্মার্টফোনে ফেসবুকটা খুললো । বেশ কয়েকটা নোটিফিকেশন এসেছে । কালকে সে তপোব্রত ঘোষের কবিমানসী ও সাম্প্রতিক রবীন্দ্র – কাদম্বরী চর্চার একটা রিভিউ লিখেছিলো । তার উত্তরে বেশ কয়েকটা কমেন্ট এসেছে । তার বন্ধু প্রবুদ্ধ , কলকাতার একটা কলেজে পড়ায় , বেশ বড়ো একটা কমেন্ট করেছে । সে মন দিয়ে পড়ছিলো । রবীন্দ্রসাহিত্যে কাদম্বরী দেবীর প্রভাব নিয়ে বাঙালীর একটা আতিশয্য আছে বলে সে মনে করে । বাঙালীর অবদমিত লিবিডো বোধ করি এই বিষয়টি নিয়ে উত্তেজিত হয়ে ওঠে । সমস্যা হলো রবীন্দ্রনাথ নিজেই নষ্টনীড় লিখে একটি জনশ্রুতিকে প্রাতিষ্ঠানিক মান্যতা দিয়েছিলেন । এবং অমল – চারু সম্পর্কের পাশাপাশি উমাপদর প্রতারণার ন্যারেটিভ তৈরি করে বিষয়টিতে একটি অন্য মাত্রা যোগ করে আরও জটিল করে তুলেছিলেন । অন্যমনস্কভাবে তার চোখ ঘড়ির দিকে চলে গেলো । বেলা নটা বেজে গিয়েছে । হাতে একদম সময় নেই । সে স্নান করতে যাওয়ার জন্য উঠলো । বেলা বাড়ার সাথে সাথে বাঁকুড়ার গরম যেন আরও অসহনীয় হয়ে উঠেছে । শাওয়ারের জল তার গায়ে ছড়িয়ে পড়তে থাকে । সে গুণগুণ করে গান গাইতে থাকে ‘ মধ্যদিনে যবে গান বন্ধ করে পাখি / হে রাখাল , বেণু তব বাজাও একাকী’ ।

বাঁকুড়া কালেক্টরেটে তার চেয়ারটাকে সবাই আন্টার্কটিকা বলে । কারণ তার চেয়ারের এসি সবসময় ১৮ ডিগ্রীতে থাকে । সে নিজের চেয়ারে বসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো । টেবিলের ওপর পড়ে থাকা ফাইলগুলো সই করছিলো সে ।

“স্যার, আজকে একটা ইমপেকশন আছে” । অনিকেত মুখ তুলে চেয়ে দেখলো রাজীব দাঁড়িয়ে আছে ।

“কোথায় বলতো” ।

“মের্থানা প্রাইমারী স্কুল, বড়জোড়া ব্লক” ।

অনিকেতের মেজাজটা খিঁচড়ে গেলো । এই অসহ্য গরমে তাকে বাইরে যেতে হবে । প্রতিদিন কতজন ছাত্রছাত্রী মিড ডে মিল খেলো তা এস এম এস করে মাস্টারমশাইদের জানাতে হয় । সেরকম এস এম এস যে স্কুলগুলো থেকে নিয়মিত আসছে না , সেখানে ইমপেকশন করার একটা পরিকল্পনা সে নিজেই নিয়েছিলো । সেই অনুযায়ী আজ তার যাওয়ার পালা । সে রাজীবকে বললো -----

“লাস্ট তিনমাসের রিপোর্টটা নিয়েছো?”

“নিয়েছি স্যার” ।

‘আচ্ছা তুমি আলি সাহেবকে ডাকো, আমি চট করে গুছিয়ে নিই’ ।

রাজীব বেরিয়ে যায় । আলি সাহেব অনিকেতের গাড়ির ড্রাইভার । ডি এম পুলে প্রায় বছর পঁচিশ গাড়ি চালাচ্ছেন । নিখুঁতভাবে বাঁকুড়া শহরের ট্রাফিক জ্যাম কাটিয়ে গাড়ি যখন দুর্গাপুর – বাঁকুড়া রোডে এসে পড়লো , তখন অনিকেত একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো । এই রাস্তার চারদিকে শালবন । দুদিকে সবুজের সমারোহ । দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায় ।

“যা গুমোট হয়েছে, আজ ঢালবে বলে মনে হচ্ছে” ।

রাজীব ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বললো । রাজীব মিড ডে মিল সেলের ডাটা এন্ট্রি অপারেটর । অনিকেতের সমস্যা হলো সে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যাপারে একদম আনাড়ি । ফলে রাজীবের সহায়তা ছাড়া তার এক মুহূর্তও চলে না । অনলাইনে কেনাকাটি , ইলেকট্রিক বিল দেওয়া , নেট ব্যাঙ্কিং করা , ট্রেনের টিকিট কাটা সবকিছুর জন্যই তার ভরসা রাজীব । এমনকি সে যে আজ বাংলা টাইপ করছে , সেটা শেখানোর কৃতিত্বটাও রাজীবের ।

“রাজীব, দেখতো টরেন্টের লিঙ্কটা খুলতে পারো কিনা । আমি তো পারছি না” । অনিকেত তার ফোনটা রাজীবকে দিলো । রাজীবের একটি বিরল প্রতিভা আছে অন্তর্জালের আনাচ কানাচ থেকে লিঙ্ক খুঁজে বার করে সিনেমা ডাউনলোড করার ।

“কী সিনেমা দেখবো স্যার” ।

“একটা মার্শাল্যান্ড, এটা স্প্যানিশ থ্রিলার । অন্যটা এ স্পেশাল ডে । এটা ইটালিয়ান ছবি । মাস্তোয়ানি আর সোফিয়া লোরেনের” ।

রাজীব ফোনে খুঁটখাট করতে থাকে । গাড়ি বড়ো রাস্তা ছেড়ে গ্রামের রাস্তায় নামে । এবার ঝাঁকানি হবে । অনিকেতের বিরক্তি লাগছিলো । কতটা রাস্তা এখন এমন ঝাঁকুনি খেতে খেতে যেতে হবে কে জানে ।

সে একটা বই খুলে পড়তে থাকে । অশোক খোপকরের গুরু দত্ত – এ ট্র্যাজেডি ইন থ্রি অ্যাক্টস । কিন্তু মনোনিবেশ করতে পারে না । গাড়িটা বড়ো ঝাঁকুনি খাচ্ছে । রাস্তাটার অবস্থা এককথায় জঘন্য ।

“এইরকম ভাঙা রাস্তা দিয়ে আর কতোটা যেতে হবে আলি সাহেব” ।

“আর মিনিট দশেক স্যার!” এই জেলার রাস্তাঘাট আলিসাহেবের হাতের তেলোর মতো জানা ।

“আপনি একটু বসুন স্যার । আমরা একটু লোকেশনটা জেনে আসছি” ।

অনিকেত ঘাড় নাড়লো । কিছুক্ষণ পর তার মনে হলো “ একবার নেমেই দেখা যাক না !” সে গাড়ি থেকে নামলো এবং বাইরের গুমোটটা অনুভব করে একটা বিরক্তিসূচক শব্দ উচ্চারণ করতে গিয়ে থেমে গেলো । চতুর্দিক আশ্চর্যরকম নিস্তব্ধ । আকাশের রঙ তামাটে । চতুর্দিকে শালগাছের নিবিড় জঙ্গল যেন পৃথিবীর বুকের ওপর নিজের শ্যামল আঁচলটি বিছিয়ে দিয়ে এলিয়ে পড়েছে । একটি পাখি পর্যন্ত কোথাও ডাকছে না । অলস দ্বিপ্রহর এক চরাচরব্যাপী নৈঃশব্দ নিয়ে আকাশে , বাতাসে , অরণ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে । এমন পরিবেশে কথা আপনি বন্ধ হয়ে আসে । অনিকেত গাড়িতে হেলান দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো ।

“স্যার, আপনি এভাবে বাইরে দাঁড়িয়ে! জানেন এ রাস্তায় হাতি বেরোয়” ।

“হাতি বেরোলে গাড়ির ভিতর আর বাইরে থাকার মধ্যে খুব একটা তারতম্য হবে কী” । অনিকেত হেসে ফেললো । তারপর আরও আধঘন্টা জঙ্গলের মধ্যে বিসর্পিল পথ ধরে মের্থানা প্রাইমারী স্কুলের সামনে গাড়ি এসে থামলো ।

অনেকটা জমির ওপর স্কুল । শাদা বাউন্ডারি ওয়াল । গেট দিয়ে ঢুকলে ছড়ানো বাগানে সবুজের অকুপণ সমারোহ । মোরাম দেওয়া পথের দুধারের বাগানে নিয়মিত যন্ত্রের ছাপ স্পষ্ট । গাড়ি থেকে নেমে হাঁটার সময় নিজেদের চলার শব্দই নিজেদের কানে লাগে তাদের । সরকারী গাড়িটা দেখে এক ভদ্রলোক বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন । বয়স আনুমানিক পঞ্চাশ ছাপ্পান্ন । রোগা , লম্বা , একহারা সাধারণ চেহারা । গালে কাঁচাপাকা দাড়ি । চোখে মোটা কাঁচের চশমা । অনিকেত বুঝলো এই ভদ্রলোকই প্রধানশিক্ষক । ভদ্রলোক তাদের নমস্কার করে ভিতরে নিয়ে গেলেন । সর্বমোট তিনটে ঘর । মাঝখানের ঘরটা অফিস । দুপাশে দুটি ক্লাসরুম । দুঘর মিলিয়ে জনাগ্রন্থিক বাচ্ছা হবে । তারা অফিসরুমে গিয়ে বসলো । রাজীব বিষয়টা বললো । ভদ্রলোক চশমাটা মুছে মৃদু গলায় বললেন “ আমার অপরাধ নেবেন না স্যার । আমি এস এম এস করতে পারি না । ওই কাজটা সুবিমলবাবু করতেন । উনি মাসতিনেক ছুটিতে ছিলেন , অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিলো । এই কদিন হলো জয়েন করেছেন । আপনি দেখুন স্যার লাস্ট দুতিনদিন এস এম এস করা হয়েছে” ।

রাজীব ঘাড় নাড়লো । মাস্টারমশাই কাগজপত্র নামাচ্ছিলেন । অনিকেত জানালার বাইরে দিয়ে দেখছিলেন । সামনের ছড়ানো বাগানে একটা বিশাল কামিনী গাছ । থোকা থোকা ফুল ফুটে রয়েছে । একটা নাম না জানা পাখি একভাবে ডেকে চলেছে ।

“একটু ঘুরে দেখবেন স্যার, বাগানটা” ।

“থাক মাস্টারমশাই আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না । আমি নিজেই দেখে নিচ্ছি । আপনি বরং রাজীবকে একটু হেল্প করুন । তুমি খাতাপত্রগুলো একটু দেখো রাজীব, আমি একটু আসছি” ।

অনিকেত সামনের উঠোন থেকে নেমে বাগানে এলো । স্কুলের সামনে যেমন , পিছনেও তেমন অনেকটা ছড়ানো জায়গা জুড়ে বাগান । লাউ , কুমড়া , কাঁচালক্ষা , লেবু সব ফলে রয়েছে । অনিকেতের সারাজীবন কেটেছে শহরে । পড়াশুনা হিন্দু স্কুলে । সেখানে সামান্য সবুজের স্পর্শটুকুও ছিলো না । সে অবাক হয়ে দেখতে লাগলো । আকাশে এখন মেঘের আনাগোনা শুরু হয়েছে । রোদের তেজ অনেকটাই কম ।

“এদিকে দেখুন স্যার, কেমন কলা হয়েছে” । অনিকেত ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলো একজন অল্পবয়সী ভদ্রলোক এসে দাঁড়িয়েছেন । একহারা, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা । হাতে স্লিং । সে বুঝলো ইনিই সুবিমলবাবু । সে নমস্কার করলো ।

“এসব বাগান কে দেখভাল করে!”

“কে আবার! মাস্টারমশাই নিজে । রাত নেই , দিন নেই , এই স্কুল নিয়েই পড়ে আছেন । বেশ কিছু নিজের টাকাও ঢেলেছেন । পরে অবশ্য বিডিও অফিস , পঞ্চায়েত কিছু সাহায্য করেছে” ।

“উনি কী এখানেই থাকেন!”



“হ্যাঁ, এখান থেকে দুকিলোমিটার দূরে ওনার বাড়ি । সংসারে দুটি প্রাণী উনি আর ওনার স্ত্রী । ছেলেমেয়েরা সবাই প্রতিষ্ঠিত । বাইরে থাকে । আর উনি রাতদিন এই স্কুল নিয়ে পড়ে রয়েছেন । সকালবেলা এই স্কুলে চলে আসেন । বাগান করেন । আগেতো এখানে এনরোলমেন্টও অনেক কম ছিলো, স্যার নিজে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছেলেমেয়েদের ধরে নিয়ে আসেন । একদিন কেউ স্কুলে না এলে ঠিক তার বাড়ি চলে যান । খবর নেন ।

একটা ঠাণ্ডা হাওয়া ঝিরঝির করে বইছিলো ।

“আপনিও কী লোকাল” ।

“না স্যার, আমার বাড়ি বিষ্ণুপুর । এখন বড়জোড়াতে ঘড়ভাড়া নিয়ে থাকি” ।

ঘন্টা বাজছিলো । বাচ্চাদের খাওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে । অনিকেত দেখলো বাচ্চারা সামনের লম্বা বারান্দায় বসে পড়েছে । যে জায়গাটা এতক্ষণ নিস্ক্রম ছিলো , এখন বাচ্চাদের কলকাকলীতে মুখর হয়ে উঠেছে । তাকে দেখে গলার একটু নামে । রাজীব ছবি তুলছিলো । তাকে দেখে বললো ---

“স্যার কিচেনটা দেখবেন না” ।

অনিকেত দেখলো ছোট রান্নাঘর । অনিন্দ্যনীয়ভাবে পরিচ্ছন্ন । আজকের মেনু খিচুড়ি , পাঁচমিশেলী তরকারি । রাজীব একটা চামচে খানিকটা খিচুড়ি তুলে অনিকেতের হাতে দিয়ে বললো ----

“একটু টেস্ট করে দেখুন, স্যার” ।

“ওভাবে খেলে কী করে হবে স্যার । আপনি এতদূর থেকে এসেছেন, এই অবেলায় না খেয়ে গেলে হবে কী করে” । মাস্টারমশাই সামনে এসে দাঁড়ান ।

“আপনি ব্যস্ত হবেন না, মাস্টারমশাই । স্যার বাইরে কোথাও খান না” । খাওয়া নিয়ে অনিকেতের পিটপিটিনি সর্বজনবিজিত ।

কিন্তু মাস্টারমশাইয়ের গলায় একটা অদ্ভুত আন্তরিকতার সুর তার কানে এসে লাগল। মাস্টারমশাইয়ের দিকে তাকালো অনিকেত । তারপর বললো “ একদিন না হয় নিয়ম ভাঙ্গাই গেলো । চলো রাজীব কিছু খাওয়া যাক । তবে অল্প করে কিন্তু” ।

সুবিমলবাবু চেয়ার আনতে যাচ্ছিলেন , অনিকেত ইশারায় বারণ করলো । সে বাচ্চাদের সঙ্গে পা মুড়ে খেতে বসে গেলো । তার মনে পড়ছিলো নিজের ছোটবেলার কথা । সেই টানা বারান্দা । ঠাকুমা পেপ্লায় কাঁসার থালায় খাবার বেড়েছেন । তারা জ্যার্ততুতো , খুডতুতো ভাইবোন মিলে পাঁচজন তাঁকে ঘিরে বসেছে । ঠাকুমা ওই একটি থালা থেকেই পালা করে করে সবাইকে খাইয়ে দিচ্ছেন । সকালের তীব্র দাবদাহের পর প্রকৃতি এখন অনেক শীতল , অনেক সহনীয় হয়ে এসেছে । মোটা চালের খিচুড়ি , ভীষণ গরম । সে মুখে দিয়ে হশহাশ করতে লাগলো ।

“আহা, গরম লেগে জিব পুড়ে গেলো নাকি । খিচুড়িটা থালায় ছড়িয়ে নিন স্যার” । মাস্টারমশাই নিজে উঠে এসে চামচ দিয়ে খিচুড়িটা থালার উপর ছড়িয়ে দিতে থাকেন । অনিকেতের অস্বস্তি হচ্ছিলো ।

“এই যাঃ! একদম ভুলে গিয়েছি, এই তোরা শুরু করিসনি, একটু দাঁড়া” । মাস্টারমশাই উঠে গিয়ে ঘরের ভিতর থেকে একটা শিশি নিয়ে এসে একটু ঘি তার পাতে ঢেলে দিয়ে বললেন “ একটু ঘি মেখে খেয়ে নিন, স্যার । ভালো লাগবে । আমার ঘরে পাতা ঘি” ।

অনিকেত খিচুড়িটা মুখে দিলো । চমৎকার একটা ঘ্রাণ এসে তার নাকে লাগলো ।

“আপনি এদের জন্য রোজ এভাবে বাড়ি থেকে ঘি নিয়ে আসেন!”

“কী করবো স্যার । দেখতেই তো পাচ্ছেন হতদরিদ্র ঘরের ছেলেমেয়ে সব, যতটা পারি করি” । একটি বাচ্ছাকে নিজে হাতে করে খাওয়াতে খাওয়াতে মাস্টারমশাই বলে উঠলেন ।

রাজীব মোবাইলে ছবি তুলছিলো । তাদের খাওয়া হয়ে গিয়েছিলো ।

“স্যার বেরোবেন না, এবার কিন্তু বৃষ্টি নামবে বলে মনে হচ্ছে” । আলিসাহেব বললেন ।

“আপনি খেয়েছেন, আলিসাহেব” ।

“মাস্টারমশাই না খাইয়ে ছাড়লেন না স্যার! চমৎকার মানুষ । নিজে দাঁড়িয়ে থেকে খাওয়ালেন” ।

“একটা কথা বলবো” । অনিকেত ঘুরে দেখলো মাস্টারমশাই ।

“বলুন” ।

“আসলে সামনে বাইশে শ্রাবণতো । বাচ্ছাদের নিয়ে একটা অনুষ্ঠান করবো । একটু গান, আবৃত্তি । রোজ ইশকুলের পর রিহাসাল হয় । আপনি আজ এসেছেন যখন একটু দেখে যাবেন, স্যার । জানি আপনি ব্যস্ত মানুষ । কিন্তু বাচ্ছাগুলো খুব উৎসাহ পাবে” ।

অন্যদিন হলে অনিকেত এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতো । এইসব গ্রামের ইশকুলের ফাংশনে ভয়াবহ রবীন্দ্রসংগীত শোনার অভিজ্ঞতা তার আছে । তার পরিশীলিত কানে গানের বিকৃতি বড়ো পীড়া দেয় । কিন্তু আজ কেনো জানি না সে না বলতে পারলো না । বললো ---

“চলুন, কিন্তু ওদের গান শেখায় কে, আপনি?”

“হ্যাঁ আমি ছাড়া আর কে শেখাবে স্যার” ।

“আপনি গান জানেন?”

“হ্যাঁ, ওই একটু শিখেছিলাম” ।

“কোথায়?”

“ওই অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে, তেমন কিছু নয়” ।

“মেঘের কোলে রোদ হেসেছে বাদল গেছে টুটি / আজ আমাদের ছুটি রে ভাই আজ আমাদের ছুটি” । খুবই চেনা গান । সুর হয়তো লাগছে না । উচ্চারণে ত্রুটি রয়েছে । কিন্তু অনিকেতের মনে হলো এ গান যেন কোন এক যাদুস্পর্শে অনির্বচনীয় হয়ে উঠেছে । এ গানে ছুটির উপলক্ষ্যটি নতুন রকমের ।

মেঘের কোলে রোদ আসন্ন শরতকালের ইঙ্গিতবহ । নিরবচ্ছিন্ন বর্ষণের শেষে যে শরত পৃথিবীতে আসে তার পরিপূর্ণতার সম্ভার নিয়ে । বাচ্ছারা গেয়ে ওঠে ---

“কী করি আজ ভেবে না পাই, পথ হারিয়ে কোন বনে যাই

কোন মাঠে যে ছুটে বেড়াই সকল ছেলে জুটি” ।

এই ছুটির বৈশিষ্ট্য হলো এটাই যে এই ছুটিতে প্রকৃতি সবাইকে বাইরে বার করে এনেছে । নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত মানুষের যে প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক বড়ো ক্ষীণ । এছাড়াও আরও ব্যাপক অর্থ নিজের বিজন থেকে মুক্তির আহ্বান এসেছে প্রকৃতির কাছ থেকে । নিজের ক্ষুদ্র স্বপ্ন থেকে এই অনন্তের আহ্বানে বেরিয়ে আসাইতো প্রকৃত ছুটির মর্ম । এখন জীবন পাবে আরও প্রসারণ , এবং প্রকৃতির অক্পণ সঙ্গ । অনিকেত নিজেও খেয়াল করে না যে কখন সে নিজেও গলা মিলিয়ে গেয়ে উঠেছে ।

“রাখাল ছেলের সঙ্গে ধেনু চরাবো আজ বাজিয়ে বেণু

“মাখবো গায়ে ফুলের রেণু চাঁপার বনে লুটি” ।

নিজের অভ্যস্ত প্রাত্যহিকতায় কঠিন , গতানুগতিকতায় আক্রান্ত জীবনের বাইরে এসে দাঁড়িয়ে রাখাল ছেলের সঙ্গে বেণু বাজানো আর ধেনু চরানোর ইচ্ছা , নিসর্গের সঙ্গলাভের এই পিয়াসা ছুটির আকাঙ্ক্ষাকে এক অন্য মাত্রা দেয় । হয়তো সুর ঠিক লাগলো না , হয়তো উচ্চারণের প্রচুর ত্রুটি , থাকলো কিন্তু অনিকেতের মনে হলো এই সবকিছুকে ছাড়িয়ে গানের এক সপ্রাণ স্বপ্ন যেন তার সামনে মূর্ত হয়ে উঠলো । এই গানের স্রষ্টাও কী তাই চাননি । অমোঘ প্রত্যয় নিয়ে কবি সেই কথাই বলে যান নি কী , যে তাঁর আর সবকিছু মানুষ ভুলে যেতে পারে , কিন্তু তাঁর গান চিরদিন বেঁচে থাকবে । সকালবেলা এক তাত্ত্বিক বিতর্কের অদম্য ইচ্ছা নিয়ে সে দিনটা শুরু করেছিলো , কিন্তু আজ এই প্রত্যন্ত গ্রামের নিতান্ত অখ্যাত একটি ইশকুলের বাচ্ছাদের গান শুনে তার মনে হলো তার পুঁথিপড়া বিদ্যার বাইরেও এই গানের এক স্বতন্ত্র অনুভবের জগত আছে , যা এতকাল তার বোধের কাছে অপরিচিত ছিলো ।

“স্যার, গাড়িটা একটু দাঁড় করাচ্ছি । বৃষ্টির জন্য সামনে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না” । আলিসাহেব গাড়িটা দাঁড় করালেন ।

বাইরে আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি নেমেছে । পথের ধারের শালবল্লরী যেন বৃষ্টিতে স্নান করে সতেজ সপ্রাণ হয়ে উঠেছে ।

“রাজীব এগুলো ধরতো, আমি নামবো” । সে হাতের ঘড়িটা খুলে রাজীবের হাতে দিয়ে গাড়ির দরজা খুলে একলাফ দিয়ে নেমে গেলো । তার পায়ের নীচে সবুজ ঘাস, ওপরে ঘনকালো মেঘ । অঝোর বৃষ্টির ধারা তাকে অক্পণ ভাবে ভিজিয়ে দিতে থাকলো । নিদারুণ গ্রীষ্মের দাবদাহে পৃথিবীর ভিতরটা যেন ব্যথিয়ে উঠেছিলো । এমন সময় এই বৃষ্টির বড়ো দরকার ছিলো । সে একটা পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলে উঠলো “আহ”!

গাড়ির ভিতর আলি সাহেব রাজীবকে বললেন “ আজ সাহেব একদম পাগল হয়ে গেছে রে” ।

## রাস্তা পেরোলেই নদী

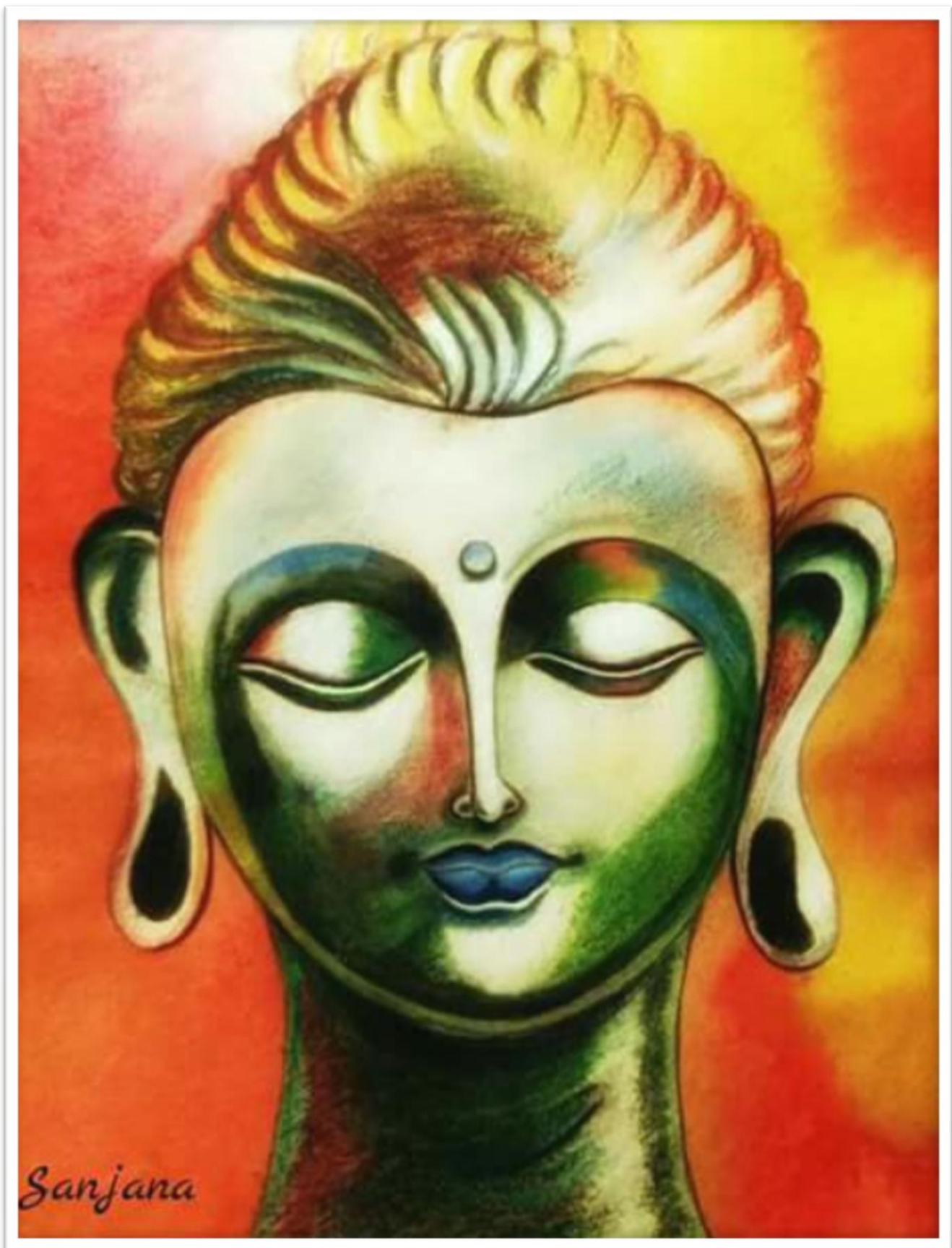
-দেবাশিস রায়কাশ্যপ

দরজাগুলো সব বন্ধ হয়ে আসছে  
রাস্তা পেরোলেই নদী...

প্রতিটি সিঁড়িপে রক্তাক্ত পা  
রেখে যায় প্রেমিক অতীত চিহ্ন  
তবু  
উতুরে হাওয়া এলে বন্ধ হয়ে যায় জানালাও

থমকে যাওয়া নিঃশ্বাসে কেতকী ফুলের গন্ধ  
আর  
পোড়োবাঁশি সুর  
সম্পর্কের নিম্নচাপ সরিয়ে তবু  
দরজায় এসে দাঁড়ায়...

এখানে মৃত্যুদীর উপত্যকারাও  
পর্দা ওড়া ব্যলকনি দেখে হাসে  
হয়ত তাই  
বন্ধ হয়ে যায় দরজা  
রাস্তা পেরোলেই স্রোতধারা সমুদ্র খোঁজে ।



## \* আমি ও তিতলী \*

-দেবানীষ তালুকদার

তিতলীর সাথে আমার সম্পর্কের গল্পটা মাত্র সাড়ে নয় মাসের।

গল্প ??? হ্যাঁ গল্পই বলা যায়, তবে ছোটগল্প। ছোটগল্পের মতো করে তিতলী এসেছিলো আমার জীবনে, আবার সেভাবেই চলে গেলো হঠাৎ !!!

শুরু থেকেই শুরু করি---

ইউনিভার্সিটিতে ওঠার প্রায় এক বছর পেড়িয়ে যাবার পরেও একটা টিউশন বা পার্টটাইম জব যোগাড় করতে পারছিলাম না। কম চেষ্টা করি নি, কিন্তু আর সবার মতোই কপাল খারাপ। শেষমেশ অনিন্দিতা ই একটা টিউশন যোগাড় করে দিলো রাসবিহারী এ্যভিনিউ তে। ক্লাস ওয়ানের একটা বাচ্চা মেয়েকে পড়াতে হবে , তাও আবার ইংলিশ মিডিয়াম এর। এর আগে যা একটু অভিজ্ঞতা ছিলো সেটা ছিলো বাংলা মিডিয়াম। যাই হোক সাহস করেই টিউশন টা নিয়ে নিলাম । পড়াতে হবে সপ্তাহে ৪ দিন, তাও দুই ঘন্টা করে। দু হাজার টাকা দেবে শুনে আর না করতে পারিনি। রাজি হয়েই গেলাম অবশেষে ।

যাইহোক, প্রথম দিন গিয়ে দেখা পেলাম আমার ছাত্রীর। ফোঁকলা দাঁতের একটা মেয়ে, চকলেট খেতে খেতে দাঁতের প্রায় ১৩ টা বাজিয়ে ফেলেছে ! নাম জিজ্ঞেস করলাম....

ফোঁকলা দাঁত নিয়েই জবাব দিলো....

"তিতলী, আমার নাম তিতলী.....তোমার নাম কি?"

চমকে গিয়ে জবাব দিলাম "দেবা"

ও বললো "পুরো নাম বলো"

আমি আবার চমকালাম !!! ( কি করে, যে এই মেয়েকে আমি পড়াবো, মনেহয় ওই আমাকে পড়াবে)

বললাম "দেবানীষ ".....

সাথে সাথে ঝটপট উত্তর অন্য দিক থেকে, আমার পুরো নাম হলো গিয়ে "তিতাস ব্যানার্জী" সবাই তিতলী বলে ডাকে, শুধু পাপা ডাকে "তিতা", জানো পাপাটা অনেক পচা, কি করে একটা বড় মেয়েকে (সিরিয়াসলি ??? কিছু বলার নেই) ডাকতে হয় সেটাও জানে না.....

আরো কি কি যেন বলছিলো এক নাগাড়ে ইংলিশ-বাংলা মিশ্র করে। আর আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেবে অবাক হচ্ছিলাম এই পুঁচকি পাঁকু বুড়িটাকে পড়াবো কি করে আমি !!! এর মধ্যেই আমাকে অবাক করে দিয়ে বলে বসলো তিতলী.....

"আচ্ছা তোমাকে কি বলে ডাকবো? মা বলেছে তোমাকে স্যার বলতে। আর বাবা বলেছে দাদা বলতে, আর শোনো আমাকে কিন্তু একদম তিতা বলা যাবে না.....কেমন !!!, তিতা বললে আমি ভীষন রেগে যাই কিন্তু। বাবা যখন বলে তখন আমি রাগ করে কিটক্যাট খাই।"

আর কথা বাড়তে না দিয়ে বললাম " না না থাক বাবু ,আমি তোমাকে তিতলী বলেই ডাকবো। আর তুমি আমাকে দাদা বলে ডাকতে পারো।

তিতলী বলে উঠলো..... "আমি কিন্তু বাবু না ,আমি অনেক বড় (দু হাত ছড়িয়ে মেপেও দেখালো কতো বড়)। আর আমি তোমাকে "স্যার-দাদা" বলে ডাকবো কিন্তু".....

(কি ফ্রিয়েন্ডিভ নাম রে ভাই,এই মেয়েকে তো আমাদের ইউনিভার্সিটি তে ভর্তি করানো দরকার) কি আর করা,হ্যাঁ সুচক মাথা নেড়ে তিতলীর বকবক শুনতে শুনতে ওকে পড়াতে শুরু করলাম।

তিতলীকে পড়াচ্ছি প্রায় এক মাস হয়ে গেলো। খুবই বুদ্ধিমতি একটা মেয়ে,অল্প একটু বললেই বুঝে ফেলে। সমস্যা একটাই,খুব বেশী কথা বলে পুচকিটা। আমি নিজে একটু চুপচাপ স্বভাবের তাই বেশী কথা বলা মানুষদের একটু কমই পছন্দ করি। কিন্তু তাও কেনো যেনো মেয়েটার উপর একটা মায়ী জন্মে গেছে এই এক মাসেই। আমার নিজের কোনো আপন বোন নেই। দুই ভাই এর মধ্যে

আমিই বড়। তাও আবার ছোট ভাইয়ের সাথে প্রায় ১২ বছরের গ্যাপ। একটা বোনের অভাব সবসময়ই অনুভব করি। এর জন্যই বোধহয় তিতলির উপর মায়ী নামক অনুভূতির জন্ম হয়েছে ।

আমাকে তিতলী ইউনিক আর ইনোভেটিভ ভাবেই জ্বালাতো বলা যায়। একদিন পড়াচ্ছিলাম "I go to school by school bus"..... সাথে সাথেই সে ফেপে উঠলো ।

"না স্যার-দাদা,আমি একদমই স্কুল বাসে যাইনা,আমি আমাদের গাড়িতে করেই যাই।"..... বোঝানোর চেষ্টা করলাম তাকে,কিন্তু আমার সবরকম চেষ্টা বিফলে গেলো ।

মাঝে মাঝে অদ্ভুত সব প্রশ্ন করতো তিতলী। একদিন আমাকে জিজ্ঞেস করলো.....

"আচ্ছা স্যার-দাদা,আমি এতো কথা বলি কেনো বলোতো ????".....

চুপচাপ শুনে যেতাম ওর কথাগুলো। উত্তর দিতাম না। খালি মাথা নাড়াতাম। আমার মাথা নাড়ানো দেখে ও কি বুঝতো কে জানে ।

প্রথম মাসে বেতন টা নিতে গিয়েই সবচেয়ে বড় ধাক্কাটা খেলাম তিতলীর মায়ের কাছ থেকে। কথায় কথায় তিনি বললেন..... "বাবা,আমি জানি তিতলী একটু বেশী কথা বলে সবাইকে জ্বালায়। তুমি কিন্তু ওর কথায় কিছু মনে করো না । মেয়েটা অসুস্থ তো তাই কিছু বলি না ওকে".....

ভেবেছিলাম এমনিই হয়তো সাধারণ কোনো অসুখ-বিসুখ এর কথা বলছে আন্টি। তাই অসুখের ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করলাম ওনাকে।

"মেয়েটা জন্মাবার সময় হাটে একটা ছিদ্র নিয়ে জন্মেছে,জন্মের সময়ই আমার একমাত্র মেয়েটা মৃত্যু হাতে নিয়ে দুনিয়ায় এলো"..... বলেই উনি অঝোরে কাঁদতে লাগলেন ।

শান্তনা কিভাবে দিতে হয় জানি না,তাও আবার একজন মা কে । হাতে টাকার খাম টা নিয়ে নিচের দিকে তাঁকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই করার ছিলো না তখন। চুপচাপ বসে দেখছিলাম একটা মা

কিভাবে কাঁদে তার সন্তানের জন্য ।

কাঁদতে কাঁদতেই আন্টি ওর সম্পর্কে বললেন। ছিদ্র টা ধরা পড়বার পর থেকেই অনেক ডাক্তার দেখানো হয়েছে তিতলীকে। কেউ আশ্বাস দিয়েছে, কেউ বলেছে আশা ছেড়ে দিতে। তারপরেও ওর মা-বাবা আশা ছাড়েনি। প্রায় প্রতি মাসেই নতুন নতুন ডাক্তার এর কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওকে, চেকআপ করানো হচ্ছে। কিন্তু কেউই সন্তুষ্ট করতে পারছে না তাদের। আর এই অসুখের ব্যাপারটা তিতলী নিজেও জানে। (অবাক হলাম ভেবে, এইটুকু একটা বাচ্চা কি করে লুকিয়ে রাখতে পারে নিজের এতবড় অসুখের কথাটা)

কথাগুলো বলে চোখ মুছতে মুছতে আন্টি নিজেই উঠে গেলেন। চলে এলাম আমিও।

এরপর থেকেই তিতলীর উপর মায়ামা আরো বেশী বেড়ে গেলো। করুনা নাকি সহানুভূতি থেকে সেটা জানি না।

নিজের আপন বোন ভেবেই ওর পাশে থাকা শুরু করলাম। ও বুঝতে পেরেছিলো কিনা জানি না। আমাকে "স্যার-দাদা" বলে ডাকার অনুমতি ও নেয়নি, কিন্তু ওকে "তুই" বলে ডাকার অনুমতি টা নিয়েছিলাম ওর কাছ থেকেই। ওর জন্য কিটক্যাট আর কমিক্স কিনে আনতে লাগলাম। আস্তে আস্তে চুপচাপ স্বভাবের এই আমি ওর মতোই হয়ে যেতে লাগলাম।

একদিন ওকে পড়ানোর সময় মানিব্যাগটা বের করে কি যেন খুঁজছিলাম। হঠাৎ খেয়াল করে দেখি ও হোমওয়ার্ক বাদ দিয়ে উঁকি মেরে মানিব্যাগ এর দিকে তাকিয়ে আছে। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম "কিরে এভাবে তাকিয়ে আছিস কেন তুই"

"মেয়েটা কি তোমার জি.এফ স্যার-দাদা?"

ওর বাড়িয়ে দেওয়া আঙ্গুলের দিকে খেয়াল করে দেখলাম ও আমার মানিব্যাগ এ রাখা অদিতির ছবিটা দেখাচ্ছে (বুঝতে পেরেই আমি যেনো আকাশ থেকে পড়লাম, এতোটুকু মেয়ের গেসিং পাওয়ার দেখেও অবাক হলাম, অবশ্য ইংলিশ মিডিয়াম এর স্টুডেন্ট, তার উপর এটা ২০১৪ সাল, সবই এখন টেকনোলজির উপর চলছে। সেই অবস্থায় এই মেয়ের এতোটুকু পাকামো করাটা দোষের কিছুই না)

ওর মাথায় গাঁড়া মেরে বললাম "পাকামো বন্ধ কর, এটা কেউ না, তুই তোর কাজ কর".....

নাছোড়বান্দা সেই মেয়ে বই খাতা বন্ধ করে বললো....

"বলতেই হবে আমাকে, নইলে পড়বো না"

উপায় না দেখে বললাম....."হম, জি.এফ"

তিতলী নাম জিজ্ঞেস করায় বললাম "তোর এই দিদিটার নাম অদিতি.....।

ও বললো....."আমাকে দিদির সাথে দেখা করাবে স্যার-দাদা"

ওর কথাটা শুনেই বুকের বাম দিকটা চিনচিন করে উঠলো। অদিতির সাথে ব্রেকাপের প্রায় ১৫ মাস পার হয়ে গিয়েছে। ও থাকতে পেরেছে, কিন্তু আমি পারিনি, প্রথম ভালোবাসা বলে কথা। অদিতির স্মৃতিগুলো যন্ত্র করেই রেখে দিয়েছিলাম। সেই সুবাদেই মানিব্যাগ এ ওর ছবি রাখা। আর সেটা দেখেই তিতলী জানতে চাইলো।



ওকে বললাম "শোন তিতলী, তোর এই দিদিটা না হারিয়ে গেছে, ও ফেরার রাস্তা ভুলে গেছে, তাই আর কখনো ও ফিরবে না। এ জন্যই ওর ছবিটা রেখে দিয়েছি। আর ও যদি কখনো রাস্তা চিনে ফিরে আসে তাহলে তোর সাথে দেখা করিয়ে দেবো, ঠিক আছে পাগলী, এখন হোমওয়ার্ক কর মন দিয়ে" (মেয়েটা আমার এতোসব যাচ্ছেতাই অনুভূতির মানে বুঝবে কিনা...তা না ভেবেই কতো কথা বলে ফেললাম ওকে)

"আমি যখন হারিয়ে যাবো, তখন আমার ছবিও কি রাখবে স্যার-দাদা?" .....জিজ্ঞাসু চোখে জানতে চাইলো ও।

তিতলীর নিষ্পাপ চোখ দুটোর দিকে তাঁকিয়ে সেদিন কোন উত্তর দিতে পারিনি।

সময় খুব দ্রুতই চলে যায় বোধহয়। তিতলী কে পড়াচ্ছি আট মাস হয়ে গেছে। তবে পড়ানোর থেকে ওর সাথে সময় কাটাই বেশি। মাস শেষে টাকাটা নিতে খারাপই লাগে নিজের মনে হয়, মৃতপ্রায় একটা বাচ্চার দেখাশোনা করে টাকা নিচ্ছি। কিন্তু কিছু করার ও নেই। আবেগগুলো হেরে যায় প্রয়োজনের কাছে প্রতিনিয়ত। এর মধ্যেই একবার তিতলী কে ভেলোর-এ নিয়ে গিয়ে চেকআপ করিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। ফলাফল যে খুব একটা ভালো হয়নি সেটা আন্টি আর আঙ্কেল এর মুখ দেখেই বলে দেওয়া যায়। আর এর মধ্যেই তিতলী আমাকে শুধুই "দাদাভাই" বলে ডাকা শুরু করেছে। কিছুটা অবাক লাগলেও জিজ্ঞেস করিনি কিছু, বরং ওর মুখে এই ডাকটা শুনে বোন না থাকার অভাবটাও যেন চলে গিয়েছিলো।

তিতলীর সেমিস্টার ব্রেক চলছিলো, তাই যাদবপুরে আমার মামার বাড়ি গিয়েছি মায়ের সঙ্গে। আসার আগে আন্টি বলেছিলো তিতলীকে আবার চেকআপ করাবে। কোনো নতুন খবর পেলে আমাকে জানাতে বলেছিলাম। তিতলীকে অনেকগুলো কমিক্স আর কিটক্যাট দিয়ে এসেছিলাম। বলেছিলাম হোমওয়ার্ক গুলো সেরে রাখতে। ফোঁকলা দাতে হেঁসে জবাব দিয়েছিলো.....

"একটাও করবো না, তোমার জন্য রেখে দেবো দাদাভাই"।

পাগলীটার মুখে এই কথা শুনে হেঁসেছিলাম অনেকক্ষণ।

দুপুরবেলা ঘুমোচ্ছিলাম, এর মধ্যেই আন্টির ফোন এলো। কলটা রিসিভ করতে গিয়ে বুকের ভেতর কোথায় যেনো খচ করে উঠলো।

ফোন রিসিভ করার পর আন্টির কথা শুনে আমার পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে গেলো। তিতলী নাকি আই-সি-ইউ তে আছে। কাল রাতে হঠাৎ করেই নাকি ওর কিছু ভালো লাগছিলো না, তাই মায়ের কাছে ঘুমোতে গিয়েছিলো। এর মধ্যেই হঠাৎ করে অজ্ঞান হয়ে যায়, আর তখনই সাথে সাথে হাসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়।

কোনোরকমে বুকে প্রচন্ড একটা যন্ত্রণা চেপে, মাকে বুঝিয়ে রাত ৮টার মধ্যেই চলে এলাম তিতলী কে দেখতে। আই-সি-ইউ এর দরজার বাইরের কাচ দিয়ে দেখছিলাম আমার ছোটো ঘুমন্ত পরীটাকে। তিতার জ্ঞান নেই। ডাক্তারও কিছু ঠিক করে বলছে না।

তিতার আর গুণ ফেরেনি। রাত প্রায় আড়াইটায় চলে গেলো তিতা আমাদের ছেড়ে। কাঁদতে পারছিলাম না কেনো যেন। প্রচন্ড শোকে পাথর এর মতো অবস্থা। জমাট বাঁধা চোখে দেখছিলাম আঙ্কেল আর আন্টির অবস্থা। পরেরদিন আমার তিতলীর সংকার করা হলো। তিতলী একেবারেই হারিয়ে গেলো তখন। আমার মনের অবস্থাটা ঠিক কেমন ছিলো ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। খুব কাছের মানুষদের হারালে বুঝি এমনই হয় ??? আচ্ছা তিতলী কি আমার খুব প্রিয় মানুষ ছিলো???

তিতলী মারা যাবার প্রায় একমাস পর আন্টি কল করে তাদের বাড়িতে যেতে বললো। বাড়িতে গিয়েই প্রথমবারেরজন্য খালি খালি লাগলো সব ( তিতলীর জন্যেই আসতাম এ বাড়িতে, আর ও চলে যাবার পর আর এখানে আসার ইচ্ছে হয়নি )

তিতলীর ঘরে বসে ওর রেখে যাওয়া বই-খাতা গুলো ঘাঁটছিলাম। আমার দেওয়া হোমওয়ার্ক গুলো ও সত্যিই কমপ্লিট করে রেখে যায় নি (ও হয়তো জানতো যে, সে যেখানে যাচ্ছে সেখানে এসবের আর প্রয়োজন নেই)

ওর হোমওয়ার্কের খাতার পাতা উল্টাতে গিয়ে দেখলাম একটা পাতায় লেখা.....

"Dear Sir-Dada,

would you please keep my photo with Aditi Didi's photo in your moneybag after my death?

This is my last wish Sir-Dada....

Would you please.....???"

মৃত্যু জিনিসটা কি সেটা কি জানতো পাগলীটা ???

তিতা মারা যাবার পর একটুও কাঁদতে পারিনি। লেখাটা পরে প্রানখুলে কাঁদলাম পাগলের মতো। এক মাসের থেকেও বেশী দিন ধরে জমানো সব কান্না যেন বের হয়ে এলো। আন্টি আঙ্কেল বাড়িতেই ছিলো। আমাকে কাঁদতে দেখে দুজনেই এসে শান্তনা দিতে গিয়ে কেঁদে ফেললো। কাঁদতে কাঁদতেই আঙ্কেল বললো, তিতলী মারা যাবার আগেরদিন রাতে এসে ওনাকে বলে এটা লিখে দেবার জন্য। নিজে ঠিকভাবে গুছিয়ে লিখতে পারছিলো না বলেই বাবাকে দিয়ে লিখিয়েছিলো।

একথা শুনে কেঁদে ফেললাম আবার। রাতে আঙ্কেল আর আন্টির সাথে একসঙ্গে খেয়ে চলে আসছিলাম বাড়িতে। এমন সময় আন্টি এসে খাম ধরিয়ে দিলো একটা (শেষ যে মাসটায় তিতাকে পড়িয়ে ছিলাম তার বেতন) এবার আর টাকাটা নেবার জন্য হাত বাড়াই নি। হাত বাড়ালে তিতলী আর আমার সম্পর্কটাকে অবহেলা করা হতো। আন্টিকে অনেক বুঝিয়ে টাকাটা ফিরিয়ে দিলাম আর তিতার শেষ হোমওয়ার্ক এর খাতাটা নিয়ে বেড়িয়ে পড়লাম রাস্তায়।

ওরে তিতলী রে, কেমন আছিস তুই ওখানে? ওখানে কি কেউ তোকে কমিক্স আর কিটক্যাট দেয় রে ? তোকে আমরা সবাই খুব মিস করি রে পাগলী। তুই কি বুঝিস সেটা ? যদি বুঝিস তাহলে জবাব দিস না কেন ? এখন চুপ করে আছিস কেন তুই ? তখন তো অনেক বকবক করে সবাইকে জ্বালাতি, এখন কেন কথা বলিস না ? তোর আর আমার একটা সেলফি তুলেছিলাম একদিন, মনে আছে তোর ? ভায়োলেট কালার এর একটা ড্রেস পরা ছিলি তুই, হাতে কিটক্যাট, ফোঁকলা দাঁতের হাঁসি দেওয়া সেই সেলফিটার কথা কি তোর মনে আছে

রে বোন ? সেই ছবিটা আমি আমার মানিব্যাগ এ রেখেছি, তোর অদিতি দিদির ছবিটার পাশেই রেখেছি।  
তোর ইচ্ছেটা পূরণ করেছি তিতলী।.....

আচ্ছা তিতা, কিছু পাওয়ার চেয়ে হারানোর কষ্টটা কেনো এতো বেশী বলতে পারবি তুই ? তোর দিদির করা  
৫টা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ওকে পেয়েছিলাম, অনেক আনন্দ লেগেছিলো কয়েকদিন । তবে তোর দিদিকে হারানোর  
এতোদিন পরেও কেন এতো কষ্ট হয় বলতে পারবি ? ২ হাজার টাকায় যখন তোকে পড়ানোর দায়িত্বটা  
পেয়েছিলাম সেই আনন্দটা এক-দেড় সপ্তাহ স্থায়ী হয়েছিলো মাত্র। তুই চলে গেলি, তোকে হারানোর কষ্টটা যে  
আমাকে সারাটা জীবন বয়ে বেড়াতে হবে রে পাগলী। কেন এমন হয় ? তুই আর তোর দিদি তো কাছের  
মানুষ ছিলি না আমার, তবে কেন এতো কাছে এলি তোরা ? কেন চলে গেলি আবার একা করে দিয়ে??

তুই ভালো থাকিস তিতা, যেখানেই থাকিস না কেন। প্রার্থনা করি রে বোন। তোর এই স্যার-দাদাটা তোকে  
খুব ভালোবাসে রে তিতা, খুব ভালোবাসে .....



## নির্বাসিত স্বাধীন

-আলোকদূত

অন্ধ মনে বিশ্বাস নেই, নিশ্চাপ চাই না মোটেই  
বৃষ্টিতে সজীব হলে রক্ত মাতে সেই যুদ্ধতেই-  
এটা শিক্ষার মূল্যবোধ, নাই বা নিলাম প্রতিশোধ  
ভয় না পাওয়া চোখই হয়ে ওঠে আক্রোশ।

আমি প্রথাগত সামাজ্য বিহীন, 'নির্বাসিত স্বাধীন'  
আমি তোমাদের টয়লেটে পটি করি দ্বিধাহীন...

পাশের বাড়ি ঝগড়া জোগায় পড়শির সুড়সুড়ি  
সমাজ দেয় উস্কানি, কাঁটার খোঁচায় ফুস্কুড়ি  
বিক্রি নয় শিল্প ও কলম, সমাজ দেয় নির্বাসন  
জন্যপ্রিয় হয় সস্তা গুঞ্জন, সময়ে মিথ্যে ভাষণ।

আমি প্রথাগত সামাজ্য বিহীন, 'নির্বাসিত স্বাধীন'  
আমি তোমাদের টয়লেটে পটি করি দ্বিধাহীন...

সমাজ দেখায় তর্জনী, হিটলারের মতো জার্মানি  
সস্তা স্বপ্নের বশীকরণ বিপদ কোটায় মন হরিনী  
মোড়ল দেখায় মীমাংসা, ফতোয়া দেয় ঘর ছাড়া  
মুঠোর মতোই শব্দরা, ভাঙ্গতে পারে বুজোয়া।

আমি প্রথাগত সামাজ্য বিহীন, 'নির্বাসিত স্বাধীন'  
আমি তোমাদের টয়লেটে পটি করি দ্বিধাহীন...

## নৌকা

-এসরাত জাহান অনিন্দিতা

-এ বীরেন মাইয়্যা

-

-এ বীরেনইয়্যা। মরছস নাকি?

বীরেনের মা নৌকা থেকে মুখ বের করলো।

-বালাই ষাট, বালাই ষাট মুখপোড়া মিনষে। বয়েস হপায় দুই কুড়ি পাঁচ বছর। মরবো কেনে মোর তাগড়া জোয়ান পোলা? কি হয়ছে?

-আহা হেমু। বুড়ো কইস না রে, বুড়ো কইস না। অক্ষনও গোটা পাঁচেক বিয়া বইবার পারি।

-ও মুখপোড়া! ঘরে তর সতীন পাঁচটা। এক পাও তো সপ্তের দিক বাড়াই রাখছত, তাও কি আকলডি নাই। কি দরকার লাগছে বীরুরে।

-হেতির সাথেই কয়া লইতাম রে হেমু। তোর ছাওয়াল গ্যাছে কেনে?

-গঞ্জে আইজ হাটবার।

-অ। এটু জল টল দিবিনে নাকি?

-আর কেনে! জল চাইলা। খায়ে বিদায় হও বাপু। গজ গজ করতে করতে হারাণ চেয়ারম্যানকে জল দেয় এক কালের ডাকের সুন্দরী হেমলতা। বয়স কালে চেয়ারম্যানের সাথে বেশ ভাব ভালবাসাই ছিল তার। কিন্তু বয়স গেলেও ছুকছুকানি যায় নাই চেয়ারম্যানের। নৌকায় ভেসেই ওদের জীবন কাটে। এ গ্রাম থেকে ও গ্রাম। কোথাও ভাল লাগলে হয়তো কিছুদিন বেশি থাকে। কিংবা আবার ঘুরে ফিরে আসে। তরপদী গ্রামটা ওদের সর্দারের খুব ভাল লেগে যায়। তাই মাঝে মাঝেই ঘুরে ফিরে এসে ঠাঁই নেয়। জীবিকা নির্বাহ করে মাছ ধরে। চেয়ারম্যানের সাথেও বেশ সখ্যতা হয়ে গেছে সর্দারের। তাই হঠাৎ হারিয়ে যাওয়া, ফিরে আসায় কেউ কিছু মনে করে না।

-অ ফুলন, জল নামতিছে নাকিরে?

সবচেয়ে কোণার দিকের নৌকার দিকে তাকিয়ে ডাকলো হেমু। কুড়ি কি একুশ বছরের এক পূর্ণ যুবতী মেয়ে বেরিয়ে এলো।

-হ মাসী

-অ।

ফুলনের চেহারা রুক্ষ। কিন্তু সারা শরীরে যৌবন উপচে পড়ছে। উদ্ধত বুক, ভরাট নিতম্ব হাঁটলে ঢেউ তুলে যায়। সে ঢেউ বীরুর মত জোয়ানদের বুকে বান ডাকে। ফুলনের এক জায়গায় বেশিদিন ভাল লাগে না। বাপের কাছে খানিকটা করুণ সুরেই তৃতীয়বারের মত জিজ্ঞেস করলো,

-বাপু ভাটা পড়তিছে। নাও ভাসায়া দেই?

-সর্দারের অনুমতি নাই। সর্দার মনে হয় আরেক চাঁদ এইহানে থাইহা যাইবো।

ফুলন মুখ ভার করে। ওর খুব ইচ্ছে করে নৌকায় ভেসে বেড়ায়। স্থির জীবন কেন জানি ফুলনের ভাল লাগে না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাতের খাবারের আয়োজন করতে বসে ফুলন। বাবার ডাকের উত্তর নেয়।

-ডাকো কেনে বাপু?

-তুই কি রান্ধার তৈয়ার করস নি?

-কেনে?

-বীরুরে আইজ খাতি কয়েছি। এটু বাসমতীর ভাত করিস। আর শিবু হাট খেইকে মুরগী আইনে দিব। ঝাল দিয়ে আচ্ছামত রান্ধিবি।

বীরেন আসবে! ভাবতেই ফুলনের বুকের মধ্যে ছাঁত করে উঠলো। বীরেনকে বেশ ভালই লাগে ফুলনের। চোকা চেহারা, শরীরে এক বিন্দু বাড়তি মেদ নাই। ঘাম যখন বুক বেয়ে নাভির দিকে নেমে আসে, ফুলন মুগ্ধ চোখে চেয়ে থাকে। বীরুকে কি একবার বলে দেখবে? ভাবে ফুলন। পরক্ষণেই সেই চিন্তা বাদ দিয়ে দেয়। বীরেনকে ওর ভাললাগে। কিন্তু বীরেন তো ওর দিকে ফিরেও তাকায় না। অবশ্য বীরেন গোত্রের কোনো মেয়ের দিকেই তাকায় না। আর এইজন্যই বেশি ভাল লাগে ওকে।

ইশ! বীরেনের সাথে যদি ওর বিয়ে হতো! ভাবতেই ফিক করে হেসে দেয় ফুলন।

বীরেনের সামনে খাবার বেড়ে দিচ্ছিলো ফুলন। আজ একটু সেজেছে। চুলগুলোতে সুগন্ধী তেল দিয়েছে। আঁচড়ে বেণীকরে ফিতা দিয়ে বেঁধেছে। মুখে হালকা পাউডার। পান খেয়ে ঠোঁট দুটো টুকটুকে লাল করে ফেলেছে। কিন্তু বীরেন এসে সেই যে একবার তাকিয়েছে তারপর আর তাকায় নি। ফুলনের বাবার সাথে গল্প করছে। যেন ফুলনের অস্তিত্বই নেই। খুব যন্ত্র করে রেঁধেছে। খাওয়ার সময়ও একটা কথাও বললো না।

-হ্যা রে বীরু

-কি খুঁড়ো?

-চেয়ারম্যান এয়েছিল তোরা খোঁজে। কেন কিছু জানিস?

-চেয়ারম্যানের আর নতুন কি? ওই দুটো হরিণ পার করায় আনতো হইবো।

-সরকারী হরিণ?

-তা নয়তো কি।

-সে যে কঠিন।

-ম্যালা ট্যাকা দেয় খুঁড়ো। আর আমারে ছাইড়ে কাউরে বিশ্বাস করে না চেয়ারম্যানে।

-সাবধানে যাইস।।

-আইচ্ছা।

নৌকা থেকে নামার সময় ঝপাৎ করে শব্দ হলো।

-কি হইলো রে বীরু?

-ও কিছু না খুঁড়ো। আন্ধার রাইত তো। পা পিছলায়া গেছিলো।

-ফুলন, কুপিডা ধরতো বীরুরে। এটু আগায় দিয়া আয়।

কুপি নিয়ে বীরুর পিছু পিছু হাঁটতে থাকে ফুলন। নদীর পার উঁচুনিচু। তাই সার বেঁধে নৌকা রাখা যায়নি। যার যার সুবিধা মত রেখেছে। মাঝে আছে সর্দারের নৌকা। পাড়ের দিকটাও জংলা।

আচমকা গাছের আড়ালে থমকে দাঁড়ালো বীরেন। খেয়াল না করায় প্রায় হুমড়ি খেয়ে বীরেনের গায়ের ওপর পড়লো ফুলন।

-ফুলন

বলে পেছন থেকে এক গোছা কাঁচের চুড়ি বের করে দিল।

-আইজ গঞ্জে গেছিলাম। তর লেইগা আনছি। তরে আমি ভালো পাই।

বলে ফুলনের হাতে চুড়ি গুলো দিয়ে প্রায় দৌড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল বীরেন। আশ্চর্য এক ভালোলাগায় শিউরে উঠলো ফুলন।

দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল একভাবে। যার যার দৈনন্দিন কাজ। এর মধ্যে বীরেন, ফুলনের চোখাচোখি। একটু হাসি বিনিময়। কখনো এটা সেটা দেয়ার ছলে একটু ছোঁয়াছুঁয়ি। কিন্তু এরই মধ্যে গুণগোল হয়ে গেল। ফুলনের বাবার কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এলো সর্দার। ফুলনের বাবা বেজায় খুশি। সর্দারের সাতজে মেয়ের বিয়ে হলে নগদ পাঁচ হাজার টাকা পাবে সে। সাথে নতুন আরেকখানা নৌকা। ফুলনের কাছে প্রস্তাব রাখতেই মাথায় আগুন চড়ে গেল ওর।

-বাপু সর্দারের আরো পাঁচটে সংসার আছে।

-তা থাকুকগে। কোনো বউরে তো কষ্টে রাখে নাই। তুইও নিশ্চিত থাকবি।

-আইচ্ছা।

কোজাগরী পূর্ণিমার প্রস্তুতি চলছে নৌকায় নৌকায়। সন্ধ্যায় পাড়ে বসে আকাশ পাতাল চিন্তা করছিল ফুলন। তখনি ধূপ শব্দে পাশে তাকিয়ে দেখে বীরেন বসে আছে শুকনা মুখে।

-তুই বিয়াতে হ্যা কইরে দিলি?

-তুমি আমারে লইয়া যাইবা বীরু?

-যাইবি মোর লগে?

-যাইবো না তয় ভালবাসছি কিয়ের তরে? তোমার লগে বিয়া বসমু সংসার করমু। এই তো আমার চাওয়া। ভেসে ভেসে তোমার আদর নিমু।

বলেই জিভ কাটলো ফুলন। বীরেন ফুলনের হাত চেপে ধরেছে শক্ত করে।

-আইজই বিয়া করুম তরে। রাইতে সজাগ থাকবি। ছয় ঘণ্টা পর ভাটা পড়বো। তখন নাও ভাসায় দিমু।

বলেই চলে গেল বীরেন। উৎকর্ণ হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো ফুলন। ভাটা আসার আগে ছইয়ের গায়ে টোকার শব্দ পেল ফুলন। ঘুমন্ত বাপের প্রতি একবার তাকিয়ে সন্তর্পণে বেরিয়ে এসে বীরেনের নৌকায় উঠলো। নৌকাটা নতুন। দড়ি খুলে রাখলো। ভাটা নামতেই নৌকা ভেসে যেতে লাগলো।

অনেক দূর এসে কুপি জ্বাললো ফুলন।

-নতুন নৌকা কই পাইছো?

-তরে বিয়া কইরা এই নৌকায় তুলুম ভাইবা কারিগররে কয়া রাখছিলাম।

-আর এত মালসামাল?

-চেয়ারম্যানের কাম কইরা দিলাম না? খুশি হয় ট্যাকা কিছু বেশি দিছিলো।

-হু

-তুই খুশি হস নাই?

-খুউব

-আয় তরে এটু ভালবাসি।

আচমকা একরাশ লজ্জা চেপে ধরলো ফুলনকে। বীরেন নিজেই ফুলনের কাছে এগিয়ে গেল।

-এই নে

-কি?

-তরে আইজ বিয়া করলাম। কিছু দিমু না? একখান তাঁতের শাড়ি। যা পর অহন।

শাড়ি বদলে বীরেনের পাশে বসলো ফুলন।

-তুই অহন আমার বৌ

-হু

-লজ্জা পাইলি?

-হু

-আইজ থেইকা আমারে ভালবাসবি। আমার লগে আত্মদ করবি।

-হু



-আয় ভালবাসি

বীরেন শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো ফুলনকে। ফুলন পরম নিশ্চিন্তে মাথা রাখলো বীরেনের বুকে। ফুলন জানে এ বুকে ভরসা করে মাথা রাখা যায়। চাঁদের আলোয় গা ভাসিয়ে দিল দুটি মানব-মানবী।।

## অঙ্কন

নবমী লাহা (CLASS 8)



## ঘাসফড়িং ও আমি

-অমলেন্দু হালদার

ঘাসফড়িং এর বিয়ে দিলাম কাল

খুব ঘটা করে,মজা করে,খিলখিলিয়ে...!

আমার ছেলেটা দূরন্ত হয়েছে খুব

এতটা দূরন্ত খালি বলে-

'বাবা মজা! বাবা মজা !'

আমিই মজার খোরাক, আমিই মজারু,

মায়ের থেকে আমাকে খেতেই ভালোবাসে সে

আমিই মজারু , আমিই মজাকি !

তো সেদিন করলুম কী-

দুটো ফড়িং ধরে,আগাছার রস খাইয়ে;

মাতাল করে দিলাম দুটোর বিয়ে।

ছেলের কী তালি! বাবা মজা

বাবা মজা!

তারপর হতচ্ছাড়া ফড়িং দুটোকে নিজেকে মনে হল।

তাই দিলুম ব্যাটার পোষা-পাখির বাটিতে,

দ্যাখ মজা!

পাখিরও মজা।

নিজেতো পারিনা হনন করতে নিজেকে,

ঘুরিয়ে হত্যা করলাম ঘাসফড়িং দুটো।

ছেলের মজা

আর আমারও...

## : প্রেমের মিলন:

-মহেশ্বর মাজি

রিম্পি গলার ওড়নাটা বার বার ঠিক করছে।বিয়ের পর প্রথম কাজে জয়েন করেছে।ইয়ার এন্ডিং-এর সময়।কাজের চাপ খুব ।বার বার কেবিন ছেড়ে বসের কাছে যেতে হচ্ছে।সবকটা ব্রাঞ্জের হিসেব এখান থেকে করা হয়।একাউন্ট সেকশনে তার সাথে দীপকও আছে। একসাথে প্রায় পাঁচ বছর কাজ করা হয়ে গেল।ওদের মধ্যে খুব ভালো বন্ধুত্ব।দীপক কিছুক্ষণ ব্যাপারটা লক্ষ্য করার পর বলল।

---আচ্ছা রিম্পি ও রকম করার থেকে তো ভাল দু সাইডে দুটো সেন্টিপিন লাগিয়ে রাখতে পারো।কাজও করতে পারবে মন দিয়ে।

রিম্পির মুখে একটা লাল আভা ফুঁটে উঠল।দীপকের নজর সে দিকে নেয়।মনিটরে এ বছরের নিট গ্রোথের রেখাচিত্রটি বের করছে।কতটা ডেভলপ করল।বসকে একবার না দেখালে!রিম্পি নিজেকে গুছিয়ে নিল।

---কেন বল তো?

---এর আগে তো কখনো এতবার গলার ওড়না ঠিক করতে দেখিনি।তাই বললাম।এসির হাওয়াতে যে বার বার উড়িয়ে দিচ্ছে তা তো নয়। তাহলে?

এইবার দীপক ক্রয়ুগল নাচিয়ে হইল চেয়ারে একটা ঠেলা দিয়ে একেবারে রিম্পির মুখোমুখি চলে এল।

---বাত কেয়া হ্যায় জানেনমন? নতুন বরের নতুন রুল নাকি?

এইবার রিম্পি লজ্জা কম আর ভয় বেশি পেল।সেটা দেখে দীপক একটু অবাক হল।এই কী সেই রিম্পি!!...ইমপোসিবল..।যে মেয়েটা একদিন তাকে সারা সময় ধরে ইয়ার্কি,ঠাটার জল ছিটিয়ে তাজা গোলাপের মত সজীব রাখত।আজ সেই মেয়েটা সামান্য একটু রসিকতায় কুকড়ে গেল?দীপকের মনে সন্দেহের দানা বাঁধল।সেটা রিম্পিকে জানতে দিল না।

---হানিমুনে গেছিলে নাকি?

---গেছিলাম।

---সেই জায়গাটায় নিশ্চয়ই?

---কোন জায়গাটা?

দীপক এবারও সূক্ষ্ম নজর দিয়ে রিম্পিকে দেখল।অদ্ভুত!!

---আমি কী করে জানব সেটা? জায়গাটার নামই কোনদিন বলোনি।

---ওসব তোমাকে মিথ্যে গল্প সাজিয়ে বলেছিলাম।বাস্তবে সে রকম কী কোন জায়গা আছে? তোমার কী মনে হয়?

---আমি তো ভেবেছিলাম তুমি বোধ হয় জায়গাটাই ঘুরে এসেছ। আমাকে সারপ্রাইজ দেওয়ার জন্য নামটা বলতে চাইছ না। না হলে কেউ এত নিখুঁতভাবে বর্ণনা করতে পারে?

---ওসব কথা বাদ দিয়ে তোমার কথা শোনাও। সোনিয়া বিয়ের জন্য রাজি হল? না ওই গাছের আড়ালে আরও কিছুদিন রাশলীলা চলবে?

দীপক বুঝে গেল রিম্পি এড়িয়ে যেতে চাইছে। তাই আর জেরা করা উচিত হবে না।

---কপালগুনে সোনিয়ার মত একজন গার্লফ্রেন্ড পেয়েছি! সবসময় নিজের ক্যারিয়ার নিয়ে পড়ে আছে। এদিকে যৌবনটা যে হাত নেড়ে বিদায় নিচ্ছে, সেদিকে ভুলেও চাইছে না।

---সব দোষ তাহলে বোনটির? ...আর তোমার কোন দোষ নেই?

---আমি তো কবে থেকেই ধুতি পরার প্রাকটিশ শুরু করে দিয়েছি। ...একটা সিগন্যাল পাওয়ার অপেক্ষা।

---আজকেই সোনিয়ার সঙ্গে কথা বলে তোমার গাটছেঁড়া বাঁধার ব্যবস্থা পাকা করছি।

\* \*\* \*

---চলো রিম্পি দুপুরের খাবারটা খেয়ে আসি।

---তুমি যাও। আমার একদম খিদে নেই।

যাওয়ার আগে আজও একবার রিম্পিকে চোরা চোখে দেখে নিল দীপক। একটা ফুল যেন দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে। সেই উচ্ছল ভাবটায় ওড়ে গেছে। ভাবতে ভাবতে নিচে নেমে গেল।

রমাচাচার স্টল থেকে ওমলেট, রুটি আর দুটো রসগোল্লা খেয়ে অফিস বিল্ডিংয়ের লিফ্টে আবার পা রাখল। আট তলায় নেমে নিজের কেবিনে ঢুকে দেখল। রিম্পি ঘুমিয়ে পড়েছে। ওড়নাটা কাঁধ থেকে সরে নিচে গড়াগড়ি খাচ্ছে। রিম্পিকে নক করতে গিয়ে ওর খোলা পিঠে নজর আটকে গেল। একটা আরশকে কেউ যেন বাটালি ঠুকে নষ্ট করে দিয়েছে। পিঠের উপর আছড়ের দাগ আর খোবলানোর চিনহ। সবগুলো এক একটা নিদারুণ যন্ত্রনার কথা বলছিল। দীপক স্পষ্ট শুনতে পেল সেই আর্তনাদ! চোখের সামনে রিম্পির বাহজোড়ার মধ্যে গুঁজে থাকা মুখটা দীপক যেন দেখে নিল। বুকোর ভেতরটা চিন চিন করে উঠল। সবকিছু না দেখার ভান করে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসল। তারপর কম্পিউটারের ওডিও ফাইলটা খুলে একটা রগরগে প্রেমের গান চালু করে দিল। শব্দ পেয়ে রিম্পি প্রায় লাফিয়ে উঠল। ওঠেই ওড়নাটা ঝটপট ঠিক করে নিল। কাঁধের কাছটা দুবার ভালো করে দেখে নিল। তারপর চোখে, মুখে কৃত্রিম হাসি ফুটিয়ে বলে উঠল।

---আজ খুব মুডে আছ দেখছি। সোনিয়া বিয়ের দিনটা জানাল নাকি?

---ওটা চাকরী থেকে রিটায়ার হওয়ার পর শুনব।

\* \*\* \*\*

---প্লিজ...প্লিজ জিনি আজ অন্তত আমাকে রেস্ট দাও। শরীরটা একদম ভাল নেই। অলরেডি চারটে পাল্টে ফেলেছি। প্রচুর ব্লাড নামছে... আর পারব না আমি। সত্যি বলছি মরে যাব।

জিনির চোখে অ্যালকোহলের নেশা। বুকের ভেতর দানবীয় খিদে। পেশিতে অশুরের শক্তি। আর চোখের সামনে তার বিয়ে করা বউ-এর অর্ধনগ্ন তুলতুলে শরীর। ছাড়বে কেন? বউ মানে তার কাছে যৌন লীপ্সা মেটানোর একটা যন্ত্র ছাড়া কিছু না। ওই যন্ত্রটার ভেতরে যে একটা কোমল হৃদয় আছে। সেটা ও মানতে চাই না। তবু তার চাকরী করাটা এখনো পর্যন্ত মেনে নিচ্ছে। তবে আর বেশিদিন না। পরের মাসেই সে রিম্পিকে নিয়ে লন্ডনে চলে যাবে। শুধুমাত্র গ্রীন ভিজাটার অপেক্ষায় ছিল। রিম্পির বাকি পোশাকটুকু জিনি টেনে ছুঁড়ে ফেলল।

---এসো...কাম...কাম। মাই ডার্লিং। এসো না।

বলেই রিম্পিকে তার শক্ত দুহাতে ধরে ফেলল।...তারপর শুরু হল একটা বাঘের হরিণের মাংস খাওয়া।

জিনি তৃপ্তির ঢেকুর তুলে গা মোড়া দিয়ে শুয়ে পড়ল। আর রিম্পি মরা হরিণের হৃৎপিণ্ডের মত নিঃসাড় হয়ে পড়ে রইল এক কোনা। চোখে তার যন্ত্রনা আর স্বপ্নভঙ্গের অশ্রু টপ টপ করে গড়িয়ে পড়ছে। ওঠে বসার শক্তিটুকুও শেষ হয়ে গেছে।

\* \*\* \*\*

একটা সবুজ পাহাড়। পাখিরা আনন্দে গান জুড়েছে। না ঠান্ডা না গরম। মোলায়েম পরিবেশ। সামনে একটা লম্বা মত দীঘি। তাতে কত পদ্মফুল ফুটে আছে। পাশেই গোলাপের বাগান। প্রজাপতি ওড়ছে। ব্রমরেরা মধু খাচ্ছে।...এই তো নৌকো ভিড়েছে ঘাটে!!...সেই চেনা স্পর্শ। হাতে হাতটি রেখে শুয়ে পড়েছে তার কোলে।..কী পরম অনুভূতি!!...এ যেন মৃত্যুসুখকেও হার মানায়।...এই জায়গাটিই হল তার মধুচন্দিমা যাপনের স্বপ্নভূমি।..কিন্তু একি!!...তার তো কবেই বিয়ে হয়ে গেছে। হোটেলের ঘরে হানিমুনের খোবলানো দাগগুলো এখনো ব্যথা করে। তাহলে এ কোন জায়গায় সে চলে এসেছে?

ধড়মড় করে রিম্পি চেয়ারটায় সোজা হয়ে বসল। আজকে আবার ওড়নাটা নিচে পড়ে গেছে। তখনি খেয়াল হল তার পিছনে কে দাড়িয়ে আছে।

---তুমি!!

---ইয়েশা...কদিন ধরেই দেখছি দাগগুলো তোমার যায়নি। তাই আজ মায়ের হাতে তৈরি এই চন্দন আর কেশর ঘষাটা ব্যাগে করে নিয়ে এসেছিলাম তোমাকে দেব বলে। তুমি ওভাবে টেবিলে মুখ রেখে শুয়ে আছো দেখে হঠাৎ মনে পড়ে গেল। একটু নিজের হাতেই লাগিয়ে দিলাম। ভাল লাগছে?

রিম্পি ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়ল।

---কে বলেছে তোমাকে এতসব করতে। ও...ও. তো কিছু না।.. সেদিন কটা কাগজি তুলতে গিয়ে এই অবস্থা হয়েছে।..ও এমনিই ঠিক হয়ে যাবে।

দীপক রিম্পির ডানহাতের একটা আঙুল ধরল।

----তোমাকে কিছু বলার দরকার নেই রিম্পি।তোমার শরীরের দাগগুলো আমাকে সব কথা খুলে বলেছে।...আসলে কী জানো রিম্পি আমরা কেউ ভাল নেই।সবায় খারাপ থাকাটাকে লুকিয়ে ভাল থাকার পোশাকটুকু পরে আছি।পোশাকটা খুলে গেলেই দগদগে ঘা গুলো চক্ষিশপাটি দাঁত বের করে হাসতে থাকে।...কারু ঘা শরীরে তো কারু এই অন্তরটায়।...তুমিও কী কোনদিন জানতে আমার জীবন থেকে সোনিয়া কবেই সরে গেছে? ...কী করে জানবে?আমি দুঃখটাকে ঢাকা দিয়ে রেখেছিলাম যে!!...তোমাকে কোনদিন জানাব না ভেবেছিলাম।শুনে তুমি দুঃখ পাবে তাই।যেমন তুমি এই দাগগুলোকে আমাকে জানতে না দেওয়ার জন্য ওড়নাটা বার বার পাট করতো।জানলে আমি দুঃখ পাব?...একবারও ভাবনি রিম্পি দুঃখটা কেন পাব?...তুমি কে আমার?...পৃথিবীতে কারো দুঃখ দেখে কষ্ট হয় না। শুধু তোমার বেলাতেই কেন হবে?এর উত্তরটা তুমি আমায় বলতে পারবে রিম্পি?

রিম্পির দুচোখে অশ্রু।এ অশ্রু নিজের জন্য নয়।পড়ছে দীপকের জন্য।কতদিন ধরে বেচারা ব্রেক আপের যন্ত্রনাকে বুকের মধ্যে কবর দিয়ে,মুখে হাসি ফুটিয়ে বসে ছিল।...এয়ে কত বড় যন্ত্রনা তার থেকে ভাল কেউ জানে না।

রিম্পি আর নিজেকে বেঁধে রাখতে চাইল না। বাঁধভাঙা নদীর মত দীপকের ধুঁ ধুঁ বুকটায় ঝাপিয়ে পড়ল।

----আই লাভ ইউ দীপক।আই লাভ ইউ।

দীপক কথাটা উচ্চারণ করতে পারল না। কারণ ওর বুকের কাছে এতদিনের জমা বাষ্পটা গলা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। তাই শুধু রিম্পিকে সবুজ লতার মত জড়িয়ে ধরে হো হো করে কাঁদতে লাগল।

অফিসের সকলে হাজির হয়ে গেছে।এতক্ষণে হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানাল।সবশেষে অফিসের বসও হাততালি দিয়ে বলে উঠলেন।

----কনগ্রাচুলেশন দীপক এন্ড রিম্পি।...এতদিন পর অফিসের সৌন্দর্যটা পরিপূর্ণ হল।আমরা সবায় তোমাদের পাশে আছি।সো টেক কেয়ার।

-----সমাপ্ত-----

## যখন নামবে আঁধার

–অংশুমান রায়

প্রায় এক ঘন্টা ধরে ফোনটা রিং হয়েই যাচ্ছে! যেহেতু তোমার নম্বর থেকে কল আসছে তাই আমি ধরবো না বলেই ঠিক করে নিয়েছি, অথচ এক সময় তোমার নম্বর থেকে ফোন কল এলেই একটা অনুভূতি হতো আমার! পৃথিবীর যেকোনো কিছুরই চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে হতো তোমার সাথে বলা কথা গুলো!

অথচ আজ, এসব কিছুই ভীষণ ভাবেই গুরুত্বহীন লাগছে! আসলে অনুভূতির রাস্তা বদল করলে বোধ হয় অতীতের অনেক গুরুত্ব পূর্ণ ব্যক্তি, বস্তু এসব ভীষণ ভাবেই তুচ্ছ হয়ে যায়!

এখন মনে হয় প্রেমে না পড়েই বেশ ছিলাম! আচ্ছা প্রেম কি আমাদের বন্দী করে রাখে? তার পর অনেক দিনের পরিচিত পৃথিবীটাকে কি একটু একটু করে ছোটো করতে করতে বিচ্ছেদ পর শূন্যতা দিয়ে পূর্ণ করে সব কিছুই ?

এই মুহূর্তেই প্রেমের অদৃশ্য শেকল কেটে বেরিয়ে এসে যদিকে খুশী ছুটে গিয়ে যা খুশী করতে ইচ্ছে হচ্ছে আমার! তোমার দেওয়া প্রতিটি উপহার ছুঁড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছে করছে। তোমার লেখা চিঠিগুলোতে আগুন দিয়ে সেই আগুনের লকলকে শিখায় আগুন রেখে দেখতে ইচ্ছে করছে কতখানি জ্বালা সহিতে পারে শরীর!

মনে হচ্ছে আমায় দেখে সবাই বুঝতে পারুক আমি একটুও ভালো নেই! সবাই মনে করুক "ছেলেটা উন্মাদ হয়ে গেছে"!

মনে হচ্ছে আমি এখনই চলে যাই সেই প্রান্তরে যেখানে গোধূলির রক্তিম আকাশ মিশে গেছে দিগন্ত রেখার সীমায়,

যেখানে আর একটু পরেই আঁধার নামবে এই পৃথিবী জুড়ে!!

সকল কে জানাই শারদীয়ার প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন





## একটু হাসুন:

ডাক্তার নিমাইবাবুকে জিজ্ঞেস করছেন: ‘কাল রাতে কি খেয়েছেন?’

নিমাইবাবু : ‘কাল রাত আমি বার্গার, ফ্রেন্স ফ্রাইস আর চিকেন পিজ্জা খেয়েছি।’

ডাক্তার বিরক্ত হয়ে বললেন : ‘এটা ফেমবুক নয়, কি খেয়েছেন সত্যি করে বলুন।’

নিমাইবাবু (মুখ কাঁচুমাঁচু করে): ‘আজকে কুমড়োর ছাঁচড়া দিয়ে রুটি।’



## রোদ ওঠানো দেশের জন্য

-মৃণাল ঘোষ

গতকাল আর কোনো আপডেট দিতে পারিনি ।

কেরালার বন্যা দুর্গত মানুষদের পাশে থাকতে পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী আমরা কয়েকজন ( Soumya Chattopadhyay— সৌম্যদা'র স্ত্রী Arpita Chattopadhyay ( বৌদি ) — Sovon Banerjee — Bristi Banerjee — Ankita Roy —Atanu Banerjee — Ami Mrinal ) গতকাল সকালে জৌগ্রাম রেল-স্টেশন ও সংলগ্ন আরং-এ অর্থ সংগ্রহের জন্য বেরিয়েছিলাম । প্রথম দিকে একটু দ্বিধা ও সংকোচ থাকলেও, পরে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে আর হাসিমুখে বাড়িয়ে দেওয়া হাত দেখে আমাদের সব সংশয়-সংকোচ দূর হয়ে গেল । প্রায় সব মানুষই নিজেদের সাধ্যমতো সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন । একটু পরেই আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন তপন দাস ( পাঞ্চু দা ) , Animesh Mitra দা আর আমাদের বান্ধবী সংযুক্তা ।

কিছু মানুষ নিজেরাই এগিয়ে এসে নিজেদের সাহায্য দিয়ে যাচ্ছিল ।

চড়া রোদকে উপেক্ষা করেই আমাদের বন্ধুরা কাজ করছিল, শরীর ক্লান্ত তবু থামার বিন্দুমাত্র লক্ষণ ছিল না । আসলে কেরালার আকাশে রোদ ওঠাতে হবে , মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে হবে যে । তাই চরৈবেতি...চরৈবেতি.....মানুষের সাড়া উদ্যম গেল বেড়ে ।

সৌম্যদা ঠিক করে ফেলল গ্রামে গিয়ে সংগ্রহ করবো । তাই আধ ঘন্টার একটু বিশ্রামের পর পুনরায় গ্রামে ঘোরা । এখানে অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্ততার সঙ্গে এগিয়ে এলেন সনৎ সরকার ( #Sanat\_Sarkar ) এবং পীযুষ ব্যানার্জী ( #Pijush\_Banerjee ) মহাশয় । একজনের বয়স পঁয়ষট্টি পেরিয়ে প্রায় সত্তর ছুঁই-ছুঁই আর একজনের একাল্প ।

শুধু এঁরা নয় যোগ দিল নাসিমা ( #Nasima\_Khatun ) , #মলয়\_ঘোষ ( #Molay\_Ghosh ) আর ভাই Biman Mondal । এই আট-দশ জন মিলে যাওয়া হ'ল মানুষের দোরে-দোরে । গ্রামের ( টেঙ্গাবেড়িয়া ) মানুষও সাধ্যমতো সাহায্য নিয়ে এগিয়ে এলেন, বিশেষ করে মা-দিদি-বৌদিরা ।

গতকাল এই দুই জায়গা মিলিয়ে সাড়ে তিন-চার ঘন্টা ঘুরে মোট ৫৫০০ টাকা উঠেছে । এই টাকা পৌঁছে দেওয়া হবে আমাদের পরম বন্ধু Soumitro Soumitro , আরোহন, Rudra Banerjee সহ বর্ধমানের ছাত্রদের হাতে । ইতিমধ্যেই বন্ধুরা সাঁত্রাগাছি রিলিফ-ক্যাম্পে কাজ করে এসেছে ।

আপনাদের এই সাহায্য আমাদের বন্ধুরা সরাসরি পৌঁছে দেবে কেরালার বন্যা দুর্গত মানুষদের কাছে ।

তাই কোনো রঙ নয়, দল নয় , কোনো এন-জি-ও নয়, আসুন একজন মানুষ হিসেবে দুর্গত মানুষদের পাশে দাঁড়াই....আমাদের বন্ধুরা অঙ্গীকার বদ্ধ হচ্ছে আবারও একদিন পথে নামবে বলে , আপনাদের সবাইকে পাশে চাই..... আসুন সকলে " আরও বেঁধে বেঁধে থাকি ".....



# SOLAR ENERGY

*Article shared by Raghav Agarwal*

Solar energy is the energy received by the earth from the sun that is converted into thermal or electrical energy.

Solar energy influences Earth's climate and weather and sustains life. Although solar energy only provides 0.15% of the world's power, experts believe that sunlight has the potential to supply 5000 times as much energy as the world currently consumes.

Broadly speaking, solar energy is a term for describing a range of methods for obtaining energy from the sun. For instance, wind, biomass and hydropower are all forms of solar energy.

Wind develops through lows and highs in temperature. Wind drives waves. Rainfall, created by sun-warmed evaporated water feeds the rivers that are sources of hydro power. Fossil fuels are also forms of stored solar energy. Coal, oil and gas formed hundreds of millions of years ago from decomposed plant matter. Plant matter that grew by aid of the sun.

## Important Applications of Solar Energy in Modern Days

Some of the important applications of solar energy are summarized below:

- i) Space cooling and heating through solar architecture,
- ii) Potable water via distillation and disinfection,
- iii) Solar cooking
- iv) Solar hot water,
- v) Day lighting,
- vi) High temperature process heat for industrial purposes,
- vii) Solar air-conditioning,
- viii) Solar desalination,
- ix) Solar electricity – photovoltaic,
- x) Solar electricity – thermal,
- xi) Solar vehicles,
- xii) Solar chimney

The architectural design of the buildings helps in their passive space heating using solar Energy.

Following strategies are useful for passive space heating:

- a) Provide large south-facing windows
- b) Provide an entire wall of double-glazed windows.
- c) Provide a heavy dark-coloured south facing wall behind a layer of glass, with room air circulating by convection between the wall and the glass.
- d) Provide a flat roof covered by a pond of water. Provision should be there for an insulating screen cover for cooling requirement in summer.

Note that no mechanical equipment is needed for passive solar heating.

An active technology of solar space heating needs a collector to absorb and collect solar radiation. Subsequently fans or pumps are used to circulate the needed air or heat absorbing fluid (generally water). Water systems are more common than air systems as they offer better heat exchanger performance.

The use of solar energy for the generation of electricity-photovoltaics:

Photovoltaics (PVs) are arrays of cells containing a solar photovoltaic material that converts solar radiation into direct current electricity. Solar cells produce direct current (DC) electricity from sunlight, which can be used to power bulb/equipment or to recharge a battery, however, for grid connected power generation; an inverter is required to convert the DC to alternating current (AC)

A number of solar cells electrically connected to each other and mounted in a support structure or frame is called a photovoltaic module. Multiple modules can be wired together to form an array. In general, the larger the area of a module or array, the more electricity that will be produced

When the n-type and p-type semiconductors are sandwiched together, and irradiated with sunlight, the excess electrons in the n-type material flow to the p-type, and the holes thereby

Vacated during this process flow to the n-type through this hole and electron flow, the two semiconductors act as a cell, creating an electric field at the surface where they meet (known as p-n junction). It is this field that causes the electrons to jump from the semiconductor out toward the surface and make them available for the electrical circuit

Advantages of solar Photovoltaics

- i) Easy installation and maintenance
- ii) Pollution free
- iii) Long life
- iv) Viable for remote and isolated areas, forest, hilly, desert regions.



Disadvantages of solar Photovoltaics:

The high initial cost especially of the silicon wafer is the major constraint in the widespread use of solar cells.

Applications of photovoltaic cells and solar panels:

Photovoltaic cells are used in watches, pocket calculators, toys. Solar panels are useful to light up a house, run an irrigation pump, operate traffic lights, etc.

Solar water heater:

Solar water heater consists of a flat-plate collector, with a black bottom, a glass top, and water tubes in between. The collector is placed at a suitable angle to catch sun's energy. The black bottom of the collector gets hot by absorbing solar radiation. The heat warms up the water in the tubes. The insulated storage tank is placed above the collector, the cool water moves down into the tubes and the water moves into the tank by natural convection.

As the energy is coming from the sun, utility bills are much lower and within few years the installation cost is recovered.

(তথ্য সংগ্রাহক- প্রমিত বন্দ্যোপাধ্যায়)

## PAINTING

*By --- অরুণ ঘোষ*



## হলিউডের রূপকথারা ---- জেমস ডিন

-অনিন্দ্য গৌতম

সালটা ১৯৫৩ । বিখ্যাত পরিচালক ইলিয়া কাজান তাঁর ইস্ট অফ ইডেন ছবির জন্য মুখ্য চরিত্রে অভিনেতা খুঁজছেন । ইস্ট অফ ইডেন প্রখ্যাত মার্কিন সাহিত্যিক জন স্টেইনবেকের উপন্যাস । বিশাল এই উপন্যাসের উপজীব্য ট্রাস্ক আর হ্যামিল্টন পরিবারের তিন প্রজন্মের গল্প । পটভূমি ক্যালিফোর্নিয়ার স্যালিনাস ভ্যালি । কাহিনীর সমন্বয়কাল আঠারো শতকের মাঝামাঝি থেকে ১৯১০ সাল । কাজানের ছবি যদিও মূলত এই উপন্যাসের শেষ অংশটা নিয়ে । তাঁর ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্র কাল ট্রাস্ক । এক জটিল টিন এজারের চরিত্র । কাজান চাইছিলেন তরুণ মার্লন ব্র্যান্ডোর মতো কোন অভিনেতাকে । চরিত্রটি মন্টগোমারি ক্লিফটকেও অফার করা হয়েছিলো , কিন্তু তিনি করেননি । এমন সময় ছবির চিত্রনাট্যকার পল অসবোর্নের কথায় কাজান জেমস বায়রন ডিনকে এই চরিত্রে কাস্ট করতে রাজী হয়ে গেলেন ।

এই ছবিতে ডিনের অভিনয়ের অনেক কিছুই মূল চিত্রনাট্যে ছিলো না । যে দৃশ্যে কাল তার মাকে দেখে ফিরছে ( যে মায়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সে আগে জানতো না , পরে আবিষ্কার করে মহিলা একটি পতিতালয় চালান ) সেই দৃশ্যে ট্রেনের বক্সকারে তার হাঁটু মুড়ে শুয়ে থাকার দৃশ্যটি যা অনিবার্য ভাবে গর্ভস্থ ভ্রূণের কথা মনে পড়ায় তা ডিনেরই ইম্প্রোভাইজেশন । আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্যে যখন তার বাবা , যে চরিত্রটায় রেমন্ড মেসি অভিনয় করেছিলেন , তার রোজগারের ৫০০০ ডলার ফিরিয়ে দিচ্ছেন , চিত্রনাট্য অনুযায়ী কালের ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কথা । শুটিঙের সময় ডিন ঘর থেকে বেরিয়ে না গিয়ে মেসিকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললেন । কাজান এই টেকটিকেই রেখেছিলেন । এই ছবি অবশ্যম্ভাবীভাবে মনে পড়াবে তাঁর অন্য ছবি রেবেল উইদাউট এ কজকে । “You’re tearing me apart ! You say one thing, he says another, and everybody changes back again”. রেবেল উইদাউট এ কজে জেমস ডিনকে যখন চিৎকার করে এই সংলাপটি আমরা বলতে শুনি তখন এর অসহনীয় যন্ত্রণা আমাদের ছুঁয়ে যায় । এটা সহজেই অনুমেয় পঞ্চাশের দশকে গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত্যুর একমাস পরে এই ছবি যখন রিলিজ হয়েছিলো কী সুতীর তার অভিঘাত ছিলো । রেবেল উইদাউট এ কজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওই সময়ের তরুণ প্রজন্মের আশা আকাঙ্ক্ষা বিশেষত তাদের যন্ত্রণার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায় । বস্তুত মার্লন ব্র্যান্ডো , জেমস ডিন , মন্টগোমারি ক্লিফট , একটু পরে এলভিস প্রিসলে সেই প্রজন্মের যুগলক্ষণকে ধরে রেখেছেন ।

এই যুগলক্ষণের অন্যতম হলো একধরনের ব্যাখ্যাহীন রাগ এবং অস্তিত্বের সংকট । এই অস্তিত্বের সংকটই পরে পপ কালচারে আত্মপ্রকাশ করেছিলো । জিমের তার নিজের মায়ের প্রতি এই যে নশিয়া এটা তার ব্যক্তিগত বিষয় নয় । এর একটি সামাজিক ভিত্তি আছে । ১৯৪৩ সালে ফিলিপ ওয়াইল তাঁর জেনারেশন অফ ভাইপারস এ ‘momism’ টার্মটি ব্যবহার করেন এবং তৎকালীন মার্কিনি সমাজের অবক্ষয়ের জন্য “ascendant female dominance”কে দায়ী করেন । এর প্রতিচ্ছবিই আমরা দেখি যখন জিম পুলিশ অফিসারকে বলে “If he had guts to knock Mom once , then maybe she would be happy, and she would stop picking upon him” আবার বাবা সম্বন্ধে আর এক জায়গায় তার অনুভব “She eats



him alive, and he takes it” . হ্যামলেটের গারটুডের প্রতি ঘৃণার মতো জিমের অনুভবও এক বৃহত্তর অস্তিত্বের সংকটকে প্রচ্ছন্ন রাখে । মনে রাখতে হবে ফ্রান্সে তখন অস্তিত্ববাদ নিয়ে তুমুল আলোড়ন চলছে । লস এঞ্জেলসে অত তাত্ত্বিকতার মধ্যে না গিয়েও অস্তিত্ববাদ নিয়ে পপুলার ছবিও নিজের ভাষ্য তৈরি করে নিয়েছিলো । জুডি যখন জিমকে প্রশ্ন করে “You live here , don’t you?” জিম বলে “who lives?” । এই চরিত্রগুলির এই যে ভালনারেবিলিটি তা একান্ত ভাবে ওই সময়ের ফসল । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর আমেরিকার নিজস্ব সামাজিক সংকট তা এই ভালনারেবল নায়ক চরিত্রের জন্ম দিয়েছে । পরের দশক গুলিতে আমেরিকা যতো সুপার পাওয়ার হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে নায়ক চরিত্রগুলির মধ্য থেকে এই ভালনারেবিলিটি হারিয়ে গেছে , তারা অনেক বেশী ম্যাচো এবং একমাত্রিক হয়ে গিয়েছে ।

তৃতীয় যে লক্ষণটি এই যুগকে চিহ্নিত করে যার প্রতিভূ হিসাবে ডিন , ব্র্যান্ডো , ক্লিফটের সঙ্গে অবশ্যই কেরি গ্রান্ট এবং রক হাডসনের নাম হাসবে । একে আমরা অ্যান্ড্রোজেনেসিটি বা একধরণের সেক্সুয়াল ফ্লুইডিটি বলতে পারে । হলিউডের জেন্ডার স্ট্রাকচারের মধ্যে এক বিপরীতধর্মী ধারা । যে হলিউড গন উইথ দ্য উইন্ডে damn শব্দের ব্যবহার নিয়ে বা বিলি ওয়াইল্ডারের দ্য লস্ট উইকেন্ডে অ্যালকহলিজম নিয়ে আপত্তি করেছিলো সেখানে সমকামীতার বিষয়টির এমনতর চর্চা বিস্ময়কর নিশ্চয়ই । ডিন নিজে মিলিটারিতে জাননি তাঁর সমকামীতার কারণে । নিজের সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য ছিলো “ But I am not a homosexual . But I am not going to go through life with one hand tied in my back.” মার্লন ব্র্যান্ডো সম্বন্ধে তাঁর জীবনীকার ডারউইন পোর্টার ব্র্যান্ডো আনজিপড বইতে বলেছেন ব্র্যান্ডোর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ব্র্যান্ডোর জীবনের সবচেয়ে জটিল অধ্যায় ছিলো । পোর্টারের লেখায় তখনকার হলিউডের নায়কদের জীবনের এই দিকটি ফুটে উঠেছে “They( brando and Dean) had a relationship for a number of years but it was always turbulent ...At one point they had a big stand up fight at a party in Santa Monica , California , witnessed by dozens of people ..his affair with Montgomery Clift was a long and enduring relationship... Marlon had a bit of fling with Cary Grant, spending a weekend with him in San Francisco. Grant was also pursuing the actor Stuart Granger, who became another of Marlon’s conquest.” এইভাবে এই মাত্র তিনটি ছবিতে , তৃতীয়টি রক হাডসন , এলিজাবেথ টেলরের সঙ্গে জায়েন্ট জেমস ডিন কালচারাল আইকন হয়ে উঠতে পেরেছিলেন । ১৯৫৫ সালের ৩০ শে সেপ্টেম্বর মাত্র বাইশ বছর বয়সে শেষ হয়ে যায় এই অভিনেতার জীবন । আমেরিকান টিন এজাররা ডিনের মধ্যে তাদের প্রতিচ্ছবি দেখতে পেয়েছিলো । ডিন মারা যাওয়ার পর হামফ্রে বোগার্ট বলেছিলেন “Dean died at just the right time . He left behind a legend”. মার্জারি গারবার বলেছেন “ Dean’s iconic appeal has been attributed to the public’s need for someone to stand up for the disenfranchised young of the era , and to the era of androgyny that he projected onscreen । ফোর্বস পত্রিকা জানাচ্ছে আজও ডিনের এস্টেটের আয় বছরে পঞ্চাশ লক্ষ ডলার ।

যদিও ডিন নিজে গান জানতেন না , কিন্তু রক অ্যান্ড রোলার ধারায় তাঁর প্রভাব অনস্বীকার্য । ডেভিড আর শামওয়ে , যিনি মার্কিন সংস্কৃতি নিয়ে কার্নেগি মিলান বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করেছেন লিখেছেন “ Dean was the first iconic figure of youthful rebellion and a harbinger of youth – identity politics” . লরেন্স ফ্রাসেলা আর অ্যাল ওয়েইসি বলেছেন “ Ironically , though Rebel had no rock music in its soundtrack , the film’s sensibility --- and especially the defiant attitude and effortless cool of James Dean --- would have a great impact on rock . The music media would often see Dean and rock as inextricably linked”. এলভিস প্রিসলে বলেছেন “ I’ve made a study of Marlon Brando . And I’ve made a study of myself, and I know why girls, at least the young’uns, go for us. We’re re something of a menace”.

ডিন দুবার মরণোত্তর অ্যাকাডেমি নমিনেশন পান । একবার ইস্ট অফ ইডেনের জন্য , অন্যবার জায়েন্টের জন্য । অ্যাকাডেমির ইতিহাসে এমন ঘটনা আর ঘটেনি । লেখাটা লিখতে গিয়ে খেয়াল হলো আজ ৩০ শে সেপ্টেম্বর দিনের মৃত্যুদিন । শেষ করি দিনের একটা উক্তি দিয়ে “ Dream as if you’ll live forever . Live as if you will die today”.

## স্কেচ: তিতিষা নায়েক



# কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

## কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

(জন্ম:- ২৪ জুলাই, ১৮৯৮ - মৃত্যু:- ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১)

### (সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান অনুযায়ী)

স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকার কারণে ১৯৩০ সালে গ্রেপ্তার হন। মুক্তি পর নিজেকে সাহিত্যে নিয়োজিত করেন। ১৯৩২ সালে তিনি প্রথমবার শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে দেখা করেন। এই সালেই তাঁর প্রথম উপন্যাস "চৈতালী ঘূর্ণি" প্রকাশ পায়। ১৯৪০-এ বাগবাজারে একটি বাড়ি ভাড়া করে নিজের পরিবারকে কলকাতায় নিয়ে আসেন তারাশঙ্কর। ১৯৪১-এ তিনি বরানগরে চলে যান। ১৯৪২-এর বীরভূম জেলা সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন এবং ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংগঠনের সভাপতি হন। তাঁর লেখায় বিশেষ ভাবে পাওয়া যায় বীরভূম-বর্ধমান অঞ্চলের সাঁওতাল, বাগদি, বোষ্টম, বাড়ুরি, ডোম, গ্রাম্য কবিরাল সম্প্রদায়ের কথা। ছোট বা বড় যে ধরনের মানুষই হোক না কেন, তারাশঙ্কর তাঁর সব লেখায় মানুষের মহত্ব ফুটিয়ে তুলেছেন, যা তাঁর লেখার সবচেয়ে বড় গুণ। সামাজিক পরিবর্তনের বিভিন্ন চিত্র তাঁর অনেক গল্প ও উপন্যাসের বিষয়। সেখানে আরও আছে গ্রাম জীবনের ভাঙনের কথা, নগর জীবনের বিকাশের কথা।

১৯৫৫ সালে তিনি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের কাছ থেকে “রবীন্দ্র পুরস্কার” লাভ করেন। ১৯৫৬ সালে “সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার” পান। ১৯৫৭ সালে তিনি চীন সরকারের আমন্ত্রণে চীন ভ্রমণে যান। এর পরের বছর তিনি অ্যাফ্রো-এশিয়ান লেখক সম্মেলন কমিটি গঠনের প্রস্তুতিমূলক সভায় যোগদানের উদ্দেশ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন গমন করেন। তিনি তাসখন্দে অনুষ্ঠিত অ্যাফ্রো-এশিয়ান লেখক সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন। ১৯৬২ সালে তারাশঙ্কর পদ্মশ্রী ও ১৯৬৮ সালে পদ্মভূষণ উপাধিতে ভূষিত হন। এছাড়াও শরণস্মৃতি পুরস্কার (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), জগত্তারিণী স্মৃতিপদক (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), রবীন্দ্র পুরস্কার (আরোগ্য নিকেতন), জ্ঞানপীঠ পুরস্কার (গণদেবতা) -এ সম্মানিত হয়েছিলেন।

### #জন্ম

তিনি বীরভূম জেলার লাভপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা-মায়ের নাম হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রভাবতী দেবী। তারাশঙ্করের বাল্যজীবন কাটে গ্রামের পরিবেশেই। শিক্ষা শুরু গ্রামের স্কুল থেকে। লাভপুরের যাদবলাল হাই স্কুল থেকে ১৯১৬সালে এন্ট্রান্স(প্রবেশিকা) পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে প্রথমে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে এবং পরে সাউথ সুবার্বন কলেজে(এখনকার আশুতোষ কলেজ) ভর্তি হন। তিনি সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ইন্টারমিডিয়েট পড়ার সময় অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। স্বাস্থ্যভঙ্গ এবং রাজনৈতিক কার্যকলাপের কারণে তাঁর পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয়নি। তিনি কংগ্রেসের কর্মী হয়ে সমাজসেবামূলক কাজ করেন এবং এর জন্য তিনি কিছুদিন জেল খাটেন। একবার তিনি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টও হয়েছিলেন।

### #চলচ্চিত্র

তারশঙ্করের উপন্যাস, গল্প ও নাটক নিয়ে চল্লিশটিরও বেশি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। সত্যজিৎ রায়ও তারশঙ্করের জলসাঘর এবং অভিযান উপন্যাসের সফল চিত্ররূপ দিয়েছেন। তাঁর যেসব রচনা চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে সেগুলির মধ্যে আছে --জলসাঘর(১৯৫৮) ও অভিযান(১৯৬২) সত্যজিৎ রায়-এর পরিচালিত, অগ্রদানী [পলাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৮৩], আগুন [অসিত সেন, ১৯৬২], আরোগ্য নিকেতন [বিজয় বসু, ১৯৬৯। জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত], উত্তরায়ণ [অগ্রদূত, ১৯৬৩] কবি [দেবকী বসু, ১৯৪৯ এবং সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭৫], কাল্লা [অগ্রগামী, ১৯৬২], কালিন্দী [নরেশ মিত্র, ১৯৫৫], গণদেবতা [তরুণ মজুমদার, ১৯৭৯], চাঁপাডাঙার বউ [নির্মল দে, ১৯৫৪], জয়া [চিত্ত বসু, ১৯৬৫], ডাকহরকরা [অগ্রগামী, ১৯৫৮], দুই পুরুষ [সুবোধ মিত্র, ১৯৪৫ এবং সুশীল মুখোপাধ্যায়, ১৯৭২] ধাত্রীদেবতা [কালীপ্রসাদ ঘোষ, ১৯৪৮], না [শ্রীতারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৫৪], ফরিয়াদ [বিজয় বসু, ১৯৭১], বিচারক [প্রভাত মুখোপাধ্যায়, ১৯৫৯], বিপাশা [অগ্রদূত, ১৯৬২], মঞ্জরী অপেরা [অগ্রদূত, ১৯৭০], রাইকমল [সুবোধ মিত্র, ১৯৫৫], শুকসারী [হারানো সুর গল্প অবলম্বনে, সুশীল মজুমদার পরিচালিত, ১৯৬৯], সন্দীপন পাঠশালা [অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়, ১৯৪৯], সম্ভ্রপদী [অজয় কর, ১৯৬১], হার মানা হার [মহাশ্বেতা উপন্যাস অবলম্বনে, সলিল সেন পরিচালিত, ১৯৭২], হাঁসুলীবাঁকের উপকথা [তপন সিংহ, ১৯৬২], এবং বেদেনি (২০১০) প্রভৃতি।

## #উল্লেখযোগ্য\_গ্রন্থ

নিশিপদ্ম ১৯৬২

ব্যর্থ নায়িকা

বিচারক, (১৯৫৭)

ফরিয়াদ, ১৯৭১

তামস তপস্যা, ১৯৫২

কালবৈশাখী, ১৯৬৩

কালিন্দী, ১৯৪০

গণদেবতা, ১৯৪২

পঞ্চগ্রাম, ১৯৪৪

আরোগ্য নিকেতন, ১৯৫৩

নাগিনী কন্যার কাহিনী, ১৯৫২

রাধা, ১৯৫৮

যোগত্ৰষ্ট, ১৯৬০

ডাইনি

একটি প্রেমের গল্প

রাধারানী

সম্ভ্রপদী, ১৯৫৭

হাঁসুলি বাঁকের উপকথা, ১৯৫১

চিরন্তনী

কবি, ১৯৪৪

কীর্তিহাটের কড়চা, ১৯৬৭

চৈতালি ঘূর্ণি, ১৯৩১

ধাত্রীদেবতা, ১৯৩৯

না, ১৯৬০

রসকলি, ১৯৩৮

পাশানপুরী, ১৯৩৩

চাঁপাডাঙার বৌ, ১৯৫৪

সন্ধ্যামলি

লেখার কথা

নীলকন্ঠ, ১৯৩৩

রাইকমল, ১৯৩৪

জলসাঘর, ১৯৩৭

যে বই লিখতে চাই

প্রেম ও প্রয়োজন, ১৯৩৫

কালাপাহাড়

বেদেনী

আমার চোখে কপালকুন্ডলা

আগুন, ১৯৩৭

মন্ডল, ১৯৪৪

হারানো সুর, ১৯৪৫

ছলানময়ী

স্বর্গমর্ত, ১৯৬৮

সন্দীপন পাঠশালা, ১৯৪৬

ঝড় ও ঝরাপাতা, ১৯৪৬

যাদুকরী

আমি যদি আমার সমালোচক হতাম অভিযান, ১৯৪৬

পদচিহ্ন, ১৯৫০

যতিভঙ্গ, ১৯৬২

বন্দিনী কমলা

ডাকহরকারা, ১৯৫৮

আমার কালের কথা

পঞ্চপুতলী, ১৯৫৬

সংকেত, ১৯৬৪

মণি বৌদি, ১৯৬৭

পৌষলক্ষ্মী

ভূতপূরণ

গল্লাবেগম

ভাসা, ১৯৬৩

বসন্তরোগ, ১৯৬৪

মঞ্জরী অপেরা, ১৯৬৪

বিপাশা, ১৯৫৮

উত্তরায়ন, ১৯৫০

মহাশ্বেতা, ১৯৬০

একটি চড়ুই পাখি ও কালো মেয়ে, ১৯৬৩

জঙ্গলগড়, ১৯৬৪

মহানগরী, ১৯৬৬

কালরাত্রি, ১৯৭০

ভুবনপুরের হাট, ১৯৬৪ অরণ্যবহি, ১৯৬৬

হীরাপান্না, ১৯৬৬

অভিনেত্রী, ১৯৭০

গুরুদক্ষিণা, ১৯৬৬

শুকসারী কথা, ১৯৬৭

শতাব্দীর মৃত্যু

শঙ্করবাস্তি, ১৯৬৭

ইতিহাস ও সাহিত্য

নবদিগন্ত, ১৯৭৩

রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার পল্লী

দুই পুরুষ (নাটক)

ছায়াপথ, ১৯৬৯

মস্কোতে কয়েকদিন

পথের ডাক

দ্বীপান্তর

বিংশশতাব্দী (নাটক)

কালান্তর

সুতপার ভপস্যা, ১৯৭১

একটি কালো মেয়ে, ১৯৭১

বিচিত্র, ১৯৫৩

নাগরিক, ১৯৬০

কাল্লা, ১৯৬২

বৈষ্ণবের আখড়া

## #নাটক

দ্বীপান্তর (১৯৪৫)

পথের ডাক (১৯৪৩)

দুই পুরুষ (১৯৪৩)

.....

## (ইন্টারনেটের সৌজন্যে)

### একটু হাসুনঃ





## PAINTING

*By* অরুণ ঘোষ



## পরকীয়া প্রসঙ্গ

-মৃণাল ঘোষ

যদিও আমি মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের এই রায় সম্পর্কে বিশেষ অবগত নই ।

তবু কথা প্রসঙ্গে বলি— এই " পরকীয়া " আসলে প্রেমের জন্য না " কামনা "-র জন্য বৃদ্ধিতে হবে । " প্রেম "-এর জন্য হ'লে, সে পুরনো কে ভুলে পুনরায় নতুন করে জীবন শুরু করবে, তাই তা আর " পরকীয়া " থাকবে না ( ডিভোর্স ) । আর শুধুমাত্র " কামনা "-র জন্য হ'লে তবে তা পরকীয়া নয় , নির্লজ্জতা -ব্যভিচার ।

প্রকৃত ভালোবাসার ভিত্তি পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস । যে নারী বা পুরুষের মধ্যে এই দুটো বিষয় বর্তমান, সে ভিন্ন পথে পা বাড়াবে না । যুগ যুগ ধরে বেশিরভাগ ভারতীয় নারী ও পুরুষ এগুলিকে নিজেদের অন্তর থেকেই আঁকড়ে ধরে আসছে..... আমরা রানী পদ্মাবতীর কথা জানি, আগুনে ঝাঁপ দিয়ে ( জহর ব্রত ) সতীত্ব রক্ষা করেছিল , তবু সহজ পথে আলাউদ্দীনের বেগম হতে পা বাড়ায় নি । এখন প্রশ্ন উঠতে পারে " সতী " শব্দটা পুরুষ সৃষ্ট । এর দায় কি কেবল নারীর ? কখনোই না । যে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস প্রেমের প্রথম শর্ত তা অন্তরে ধারণ করেই যুগ যুগ ধরে কোটি কোটি ভারতীয় নর-নারী বিশ্বাস করে " কেবল একজনকে -" ই তাঁদের মন-শরীর সঁপে দেয় । তারা পরস্পর সুখে-দুখে হাত ধরে থাকে । এটাই ভারতীয় ঐতিহ্য ।

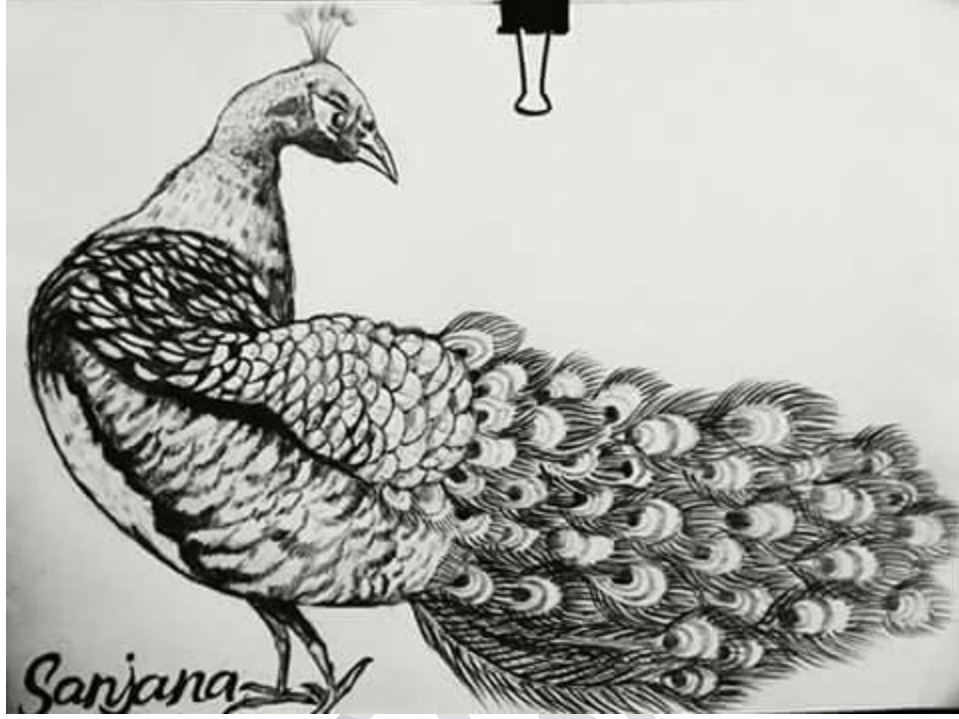
আন্টো মর্ডানিজিমের যুগে - বিশ্বায়নের যুগে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি যখন আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে গ্রাস করতে উদ্যত, তখনও কিন্তু ( আজকের দিনেও ) নারী-পুরুষ এই শ্রদ্ধা-বিশ্বাস-ভালোবাসাকে অন্তরে আগলে রেখেছে..... তাকে পণ্য হতে দেয় নি ।

তাই আজ কোটি কোটি নারী-পুরুষ, তাদের অকৃত্রিম ভালোবাসা— শ্রদ্ধা—ভক্তি, সব কিছুকে অপমান করা হচ্ছে ।

কিছু " সরীসৃপ জীব " তাদের আর অবরুদ্ধ কামনা আর বিকৃত কাম-লোলুপতা নিয়ে নির্লজ্জের মতো দাঁত বের করে হাসছে । যদি এই রকম রায় হয়, তবে তো তাদের সেই বিকৃত প্রবৃত্তিকেই উস্কে দেওয়া হচ্ছে ।

আমরা সামাজিক জীব । তাই সমাজকে অস্বীকার করা যায় না । " পরকীয়া "-র আনন্দ পেতে গিয়ে যদি ব্যভিচারে সমাজ ভরে ওঠে , তবে সেই পচনশীল সমাজ— দূষিত পরিবেশ কী করে একটা সুস্থ শিশুর জন্ম দিতে পারে ?

আমার বিশ্বাস, যে যুগ যুগ ধরে ভারতীয় নর-নারী শ্রদ্ধা-ভক্তি আর ভালোবাসা দিয়ে তাদের প্রেমের তাজমহল রূপ সংসার নির্মাণ করে আসছে, তারা অবিচল থাকবে । এই রায় সমাজ-সংসারে বিশেষ কোনো প্রভাব ফেলতে পারবে না । এই কু-প্রবৃত্তি মনে কোথাও উঁকি দিলেও, তাদের প্রিয়জনের মুখটা সবার প্রথমে মনে ভেসে উঠবে ।



### একটু হাসুনঃ

স্বামী শ্রীর মধ্যে কথা হচ্ছে....

শ্রী: 'পরিশেষে একজনে তারী তার জীবনে কি কি  
সামলাবে ? স্বামীকে সামলাবে, তার বাচ্চাকে সামলাবে..  
এরপর তার বাবা মা কে সামলাবে তার্কি তার ঘর  
সংসার !!'

স্বামী: '(খুব আনন্দ করে উত্তর দিল): তারী যদি শুধু  
তার মুখটা সামলে রাখে তাহলে সংসারে ব্যকি সব  
কিছু অটোমেটিক সামলে যাবে।'



## অর্থস্য সম্ভব্যবহারং কুরু:

-শুভম বন্দ্যোপাধ্যায়

"বলতে পারো বড়মানুষ মোটর কেন চড়বে  
গরীব কেন সেই মোটরের তলায় চাপা পড়বে"

সুকান্ত ভট্টাচার্য আমাকে একদা আজব ধাঁধার সম্মুখীন করিয়াছিলেন। এত বৎসর ধরিয়াও এই রূপ বিকট সত্য ধাঁধার উত্তর খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি নাই...। যতবারই ভাবিতে বসিয়াছি মস্তকে কী যেন দংশন করিতে থাকে। ইহা যে কীটাণু জনিত দোষ নহে তাহা বিলক্ষণ বুদ্ধিতে পারি...!!

শরৎকাল বেশ জাঁকিয়া বসিয়াছে। "আশ্বিনের শারদ প্রাতে বেজে উঠেছে আলোক মঞ্জীর।..... প্রকৃতির অন্তরাকাশে জাগরিত জ্যোতির্ময়ী জগন্মাতার আগমন বার্তা।..... " বীরেন্দ্র কৃষ্ণ মহাশয় আবৃত্তি তে কোনো কুণ্ঠা রাখেন নাই। সুর বিচ্ছুরণ জনিত আয়োজনের কোনো ত্রুটি করেন নাই। কাশের বুক চিড়িয়া যন্ত্র দানব এক্ষণে নৃত্য পটীয়াসীর ন্যায় চলিয়া যাইতেছে। শাকম্ভরী আসিতেছেন লক্ষ্মী ;সতে; কেতো গণশা কে সঙ্গে লইয়া। (তিতলি কে লইয়াও বটে!!)। ত্রয়োদশী সন্ধ্যাই বলিয়া দিতেছে আম বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব শারদীয়া.....

কোনো এক কালে ভারতবর্ষ দরিদ্র দেশের তকমা লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতো। সময় অগ্রসর হইয়াছে। দরিদ্র দেশ তকমা মুছাইয়া আপন বীর্যে অদ্য মহিরূহে পরিণত হইয়াছে। এখন কে বলিবে ইহা দরিদ্র দেশ? বাঙালি জাতির অর্থ নাই? বারো মাসে তেরো পার্বণের ধুম দেখিলে মনে হয় টাকা পয়সা বৃক্ষ পত্রের ন্যায় খসিয়া পড়ে। ধূলা-বায়ুর ন্যায় উড়িয়া বেড়ায়। যে ধরিতে জানে মাল্লু তাহারে রাজা বাদশা বানাইয়া দেয়।

কাগজে পড়িলাম অমুক জায়গায় ত্রয়োবিংশ লক্ষ খরচ করিয়া প্রতিমা বানানো হইয়াছে। তাহার পদতলে মহিষাসুর ভূপাতিত ; মহিষ নিপাতিত; সিংহ বাহনাদি -দশ হস্তের প্রক্ষালন সহ সকলই চেনা মূর্তি। ইহাও পূজিত হইবে। আবার আমাদের বারোয়ারি দশ হাজারি প্রতিমাও পূজিত হইবে। তাহলে উভয় কে পৃথক করিল কে?? কে আবার.... দৃশ্য সজ্জা আর অলংকরণ দ্বয়। আমি শুধু একটি উদাহরণ আনিলাম। এইরূপ দৃশ্য হাজার ছুঁইয়া যাইতেছে। একটি সমীক্ষা বলিতেছে শারদীয়া উপলক্ষ্যে মনুষ্যকূল যাহা খরচ করিতে পিছ পা হন না তাই দিয়া সমগ্র ভারতের বুভুক্ষু সম্প্রদায় দিগকে চতুর্দশ দিন দুই বেলা ভর পেট -পেট পূজা করানো যাইবে।



এক শ্রেণি আমাকে প্রশ্ন করিতেই পারেন তাহা হইলে আমরা কী করিব? পূজা বন্ধ করিয়া "ভিখারি নাগারি" ভোজনে ব্যাপ্ত থাকিব? -- আমি তাহা বলি নাই। বাঙালির চিরন্তন ঐতিহ্য কে ক্ষুণ্ণ করিবার অভিপ্রায় আমার বিন্দুমাত্র নাই। আর ঐতিহ্য বন্ধ করিতে চাহিব কেনো? আমি নিজেও তো বাঙালি। আমি আঙুল তুলিয়াছি শুধু "বাহুল্য" শব্দে। যে স্থলে বেদ মন্ত্র পাঠ করিয়া বিধি সম্মত শাস্ত্রীয় আচার নিয়ম কানুনাদি সারিয়া মায়ের পূজা করিবার পার্সপোর্ট পাওয়া যায় সে স্থলে আমার মুষ্টি মুষ্টি অর্থ খরচ করিয়া আলোক সজ্জা দিয়া নন্দন কানন বানাইবার কী দরকার?? ইহা তো আমোদের নামান্তর। সদ্য যৌবনে পদার্পণ করা যুবক যুবতী গণের অবাধ মিশ্রণের প্রবেশ পত্র। এই উপলক্ষে কত দেহজ মিলন ঘটিয়া থাকে; বীজ অঙ্কুরোদগমের পূর্বেই বিনষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু যাইবার প্রাক্কালে ধরনী গর্ভে দাগ রাখিয়া যায়। তাহাকে অভিশপ্ত করিয়া যায়।

ইহাকে কেন্দ্র করিয়া কাহাতক দুই পক্ষের বিবাদ; প্রতিযোগিতা লাগিয়াই আছে।

অর্থ সঞ্চয় করিও। একটু সঞ্চয়ী হউ। অনেকেই বলিবেন -- "আমি তো অর্থ লইয়া উপরে যাইবো না।" তাহাকে বলি ভাই; তুমি অর্থ লইয়া উপরে না যাইলেও অর্থই তোমাকে উপরের চৌকাঠ ডিঙাইবার আগে পর্যন্ত দেখিবে। পিতা মাতা পল্লী পুত্র কন্যা কেহই তোমার পাশে চিরকাল থাকিবে না। যাহা থাকিবে সে হইল..... হ্যাঁ ঠিক বুঝিয়াছ। আর একটি কথা বুঝিয়া দি। ইহার বড় বিপত্তারিণী ইহজীবনে আর পাইবে না।

যদি তুমি সঞ্চয়ী না হইতে ইচ্ছুক যদি মন করো আসক্তি শূন্য -- তাহা হইলে তুমি তোমার উপার্জিত অর্থ দান করিয়া যাও। দানের ফল কস্মিনকালেও বৃথা যায় নাই। পুরাণে ইহার অজস্র উদাহরণ পাইবে। লক্ষ দামী মূর্তির সম্মুখে হাজার টাকা রাখিলে উহা কৈলাস পর্যন্ত পৌঁছাইবে না। ব্রাহ্মণাদির ট্যাঁকে গোজা পড়িবে। কিন্তু ভাবিয়া দেখো ওই হাজার টি টাকায় কী না হইতে পারিত। অনাথা নূতন জামা পাইত। উপবাসী খাদ্য পাইত। আরও কত কী.. যে ঈশ্বর কে তুমি অর্থ ঢালিয়া দিতেছ সেই ঈশ্বরের ঐশ্বরীয় সাজ তো আজ বাদে কালই ধুইয়া যাইবে। আবার সেই খর বিচুলির মন্ড। তুমি তাহাতে মাথাও নোয়াইবে না। তাহা হইলে তোমার ঈশ্বর কোথায় গেলো?

পিছন ফিরিয়া দেখো.... জীবন্ত ঈশ্বরেরা ভিক্ষা করিতেছে। খাদ্য না পাইয়া ডেনড্রাইট ; ন্যাপথলির নেশায় মাতিয়া উঠিতেছে... অথচ এ স্থলে তোমরা উদাসীন। উহাদের দক্ষিণা দিবার জন্য পরিধানের পশ্চাৎ হাতড়াইয়া মরো। ইস! ছিঃ.....

ভগবান কী তোমাদের ডাকিয়া বলিয়াছে এত জাঁক জমক করিয়া আমার পূজা করিবে; আলোক সজ্জা; শব্দ সজ্জায় আমায় নান্দনিক করিয়া তুলিবে। মানত করিবে। মানত পূরণ হইলে ছাগ প্রাণাদি বলি দিবে...। ইত্যাদি ইত্যাদি। আসলে এগুলি তোমাদিগের ব্রহ্ম ধারণা। মূর্খামি। সত্যকার পূণ্য এস্থলে কিছু নাই। পূণ্য অর্জন করিতে চাও? দেখো.... দুই চক্ষু প্রসারিত করিয়া দেখো... উৎসবীয় আলোক ছটা ছাপাইয়া আর এক স্ময়মান রক্তাভ বিন্দু চোখে পড়িবে। উহার দিকে ধাবমান হউ। --- ভরসা রাখো। তোমাদের ভাঙা মেরুদণ্ড জোড়া লাগাইবার জন্য স্বামীজি আবার জন্ম নেবেন। তোমরা আবার শুনিতে পাইবে "ওঠো জাগো..... লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত থামিও না"-র সেই অমোঘ বাণী।

কেনো? তোমরা কি শুনিতে পাওনা এপ্রজন্মের কবিও তো বলিয়াছেন---

"যে দেশে পেটেই জ্বলে অধিকাংশ চিতা  
সে দেশে বিশ্বাস পণ্য; ধর্ম বিলাসিতা "

---





## সম্পাদনা :

শুভম বন্দ্যোপাধ্যায়

যারা তৈরি করেছে স্বপ্ন:

অঙ্কিত চ্যাটার্জি; প্রতাপ মূধা; প্রমিত বন্দ্যোপাধ্যায়

*\*সকল পাঠক পাঠিকা দেব জানাই শুভ শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা\*\**

হাতে হাত রেখে সুখী হয়ে থাক আধভেজা কিছু মন.....  
আমার আমিটা পেয়ে যাক প্রিয়  
- রইল  
**আত্মজন**  
সহযোগী ভূমিকায় : (তিতাস; সঞ্চরী; মানব; সৌমেন; অঙ্কিত ; সুমন)  
**প্রচ্ছদ ও সম্পাদনা : শুভম বন্দ্যোপাধ্যায়**  
[অতিথি কলমদের জানাই স্বাগতম]